বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

প্রফেসর ড. অনিরুদ্ধ কাহালি

প্রফেসর ড. দেলওয়ার মফিজ

গৌতম গোস্বামী

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি পাঠ্যপুস্তকটি সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত। বইটিতে দুটো অংশ রয়েছে। একটি ব্যাকরণ অন্যটি নির্মিতি। ব্যাকরণ অংশে সপ্তম শ্রেণির জন্য ব্যাকরণিক বিষয়সমূহ সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় উদাহরণসহ প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে প্রতিটি বিষয় আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে। অপরদিকে নির্মিতি অংশের বিষয়সমূহ শ্রেণিমান ও মানবণ্টন অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। আশা করা যায়, বইটি শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকারে আসবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	ভাষা	১–৯
২.	ব্যাকরণ	১০–১১
৩.	ধ্বনি ও বর্ণ	১২–১৭
৪.	সন্ধি	১৮–২৬
৫.	শব্দ ও পদ	২৭
	কারক ও বিভক্তি	২৭–৩৪
	সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ	৩৪–৩৮
	শব্দরূপ	৩৯–৪০
	বিশেষণের 'তর' ও 'তম'	৪১–৪২
৬.	শব্দগঠন	৪৩–৪৫
	উপসর্গযোগে শব্দগঠন	৪৫–৫২
	প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন	৫২–৫৭
৭.	বাক্য	৫৮–৬২
৮.	বিরামচিহ্ন	৬৩–৬৭
৯.	বানান	৬৮–৭৩
১০.	শব্দার্থ	৭৪
	একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ	৭৪–৭৮
	বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা	৭৯–৮২
	সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা	৮২–৮৫
	এক কথায় প্রকাশ	৮৫–৮৮
	বাগ্‌ধারা	৮৮–৯১

ক্রমিক নং	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১১.	নির্মিতি	৯২–১২৮
	রচনা	৯২–১১০
	১. আমাদের জাতীয় পতাকা	৯২
	২. আমাদের গ্রাম	৯৩
	৩. দর্শনীয় স্থান	৯৪
	৪. বাংলাদেশের নদনদী	৯৬
	৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম	৯৭
	৬. কী ধরনের বই আমার পড়তে ভালো লাগে	৯৯
	৭. আমার চারপাশের প্রকৃতি	১০০
	৮. আমার দেখা একটি মেলা	১০২
	৯. একটি দিনের দিনলিপি	১০৩
	১০. শহিদ মিনার	১০৫
	১১. টেলিভিশন	১০৬
	১২. শৃঙ্খলাবোধ	১০৮
	১৩. সুন্দরবন	১০৯
	অনুধাবন দক্ষতা	১১১
	সারমর্ম/সারাংশ	১১২–১১৪
	ভাবসম্প্রসারণ	১১৫–১২০
	আবেদনপত্র ও চিঠি	১২১–১২৮

ভাষা

মানুষ ভাষা-সম্পদের অধিকারী। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন থেকেই ভাষার উদ্ভব। মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। পরস্পর ভাব-বিনিময়ের জন্য এক-এক সমাজের মানুষ গড়ে তুলেছে এক-এক রকম ধ্বনিব্যবস্থা। ভাষা হচ্ছে অর্থবহ প্রণালিবদ্ধ ধ্বনি-প্রতীক। মানুষ তার কণ্ঠনিঃসৃত যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতিকে অন্যের কাছে বোধগম্যভাবে পৌঁছে দেয়, তা-ই ভাষা (Language)। ভাষা মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে ভাষা একটি উন্নত মাধ্যম।

মানবসভ্যতার বিকাশে ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। আদিমকালে মানুষ যখন গুহাবাসী, বন্য ও অসভ্য ছিল, তখনো মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করত। তখন ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম ছিল ইশারা-ইঙ্গিত-অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি। এগুলো ভাষা বিকাশের প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচ্য। বস্তুত আদিকালে মানুষ পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য যেসব মাধ্যম ব্যবহার করত সেগুলো হলো :

(ক) ইশারা-ইঙ্গিত, (খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, (গ) নাচ, (ঘ) চিত্র ইত্যাদি।

সৃষ্টির প্রথম যুগে সভ্যতার সোপানে প্রথম পদক্ষেপ হলো সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা। আর এ থেকেই তৈরি হলো সমাজ। কালের যাত্রায় মানুষ যখন সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করল,তখন সে বুঝতে পারল যে কেবল ইশারা-ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। নিরন্তর প্রচেষ্টা, বুদ্ধি ও সাধনার মাধ্যমে কালক্রমে মানুষ ধ্বনির প্রণালিবদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহারে সক্ষম হলো।

মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাগধ্বনিই ভাষা হিসেবে গৃহীত। বলা বাহুল্য, ইঙ্গিতের মাধ্যমেও ভাবের আদান-প্রদান করা যায়, কিন্তু কণ্ঠধ্বনি হচ্ছে মানুষের অনুভূতি প্রকাশের সর্বোত্তম প্রক্রিয়া। কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে মানুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশে সক্ষম। তাই আমরা ভাষা বলতে বুঝি বাগযন্ত্র-সৃষ্ট সর্বজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিকে। অর্থাৎ মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত, নাসিকা, মুখবিবর প্রভৃতি বাগযন্ত্রের সাহায্যে বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে থাকে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

ভাষার সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞার্থ : মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মনুষ্যজাতি অপরের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে থাকে, তাকে ভাষা বলে।

ভাষাবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত ভাষাপণ্ডিতের ভাষা-সম্পর্কিত চিন্তাসূত্র উদ্ধৃত করা হলো :

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'মনুষ্যজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা।'

ভাষা সম্পর্কে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ধ্বনির দ্বারা নিস্পন্ন, কোনো বিশেষ সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।'

মূলত মানুষের মনোভাব-প্রকাশক কণ্ঠনিঃসৃত অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

ভাষার বৈশিষ্ট্য

১. ভাষা কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে গঠিত;

২. ভাষার অর্থদ্যোতকতা গুণ বিদ্যমান;

৩. ভাষা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত;

৪. ভাষা মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ ও অভ্যাসের সমষ্টি;

দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। আদি মানবের যে ভাষা ছিল,কালের প্রবাহে তা পরিবর্তিত হয়ে বহু ভাষার জন্ম দিয়েছে। এ জন্য আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন : বাংলাদেশে 'বাংলা ভাষা', ইংল্যান্ডে 'ইংরেজি ভাষা', জাপানে 'জাপানি ভাষা', রাশিয়ায় 'রুশ ভাষা' ইত্যাদি। বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের ওপর ভাষা প্রচলিত আছে।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরনো। বাংলা ভাষার উৎসমূলে যে ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়, তার নাম ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইউরোপের মধ্যভাগ হতে দক্ষিণ-পূর্বাংশ ভূভাগে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা প্রচলিত ছিল। এ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাই হলো বাংলা ভাষার আদি উৎস। তবে এ আদি উৎস থেকে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় অনেক কাল ধরে অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে সপ্তম শতকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। তবে বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল নির্ণয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ। আর ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দকে বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল বলে মনে করেন।

সাধু ও চলিত রীতি : সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পার্থক্য

বাংলাদেশের মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে, তার নাম বাংলা ভাষা। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসামের করিমগঞ্জ ও কাছাড়ের অধিবাসীদের একটি অংশের মাতৃভাষা বাংলা। বস্তুত, দেশ-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি জনসমাজে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে বাংলা ভাষা গঠিত। বাংলা ভাষা প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর সব ভাষাতেই দুটো রূপ দেখা যায়। একটি

লেখার ভাষা, অন্যটি মুখের ভাষা। ভাষারীতির দিক থেকে বাংলা ভাষার দুটি রূপ বা রীতি লক্ষ করা যায়। একটি সাধু ভাষা এবং অপরটি চলিত ভাষা।

সাধু ভাষা

সাধু ভাষা বাংলা ভাষার একটি প্রাচীন লিখিত রূপ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে পদ্যই ছিল ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। মধ্যযুগে কতিপয় ক্ষেত্রে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজে গদ্যের ব্যবহার দেখা গেলেও তা ছিল খুবই সীমিত। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলা গদ্য গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে গদ্যচর্চা শুরু হয়। সেদিনকার গদ্য লেখকগণ গদ্যগ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে মূলত নির্ভর করলেন সাধুজনের মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার ওপর। এভাবে উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের যে লিখিত রূপ গড়ে ওঠে, তার নাম দেওয়া হয় **সাধু ভাষা**। সাধু ভাষা সম্পর্কে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সাধু ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সম্পত্তি। এর চর্চা সর্বত্র প্রচলিত থাকাতে বাঙালির পক্ষে ইহাতে লেখা সহজ হইয়াছে।'

বস্তুত বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার অনুসরণে তৎসম শব্দবহুল যে সাহিত্যিক গদ্যরীতি গড়ে তোলেন, তা-ই **সাধু ভাষা** হিসেবে স্বীকৃত।

চলিত ভাষা

কোনো একটি প্রধান ভাষার আওতাভুক্ত সমগ্র ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কথ্যরূপ বা মৌখিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। মুখের ভাষাকে লিখিত ভাষায় ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে চলিত ভাষার প্রচলন হয়। তবে সবার মুখের ভাষাই চলিত ভাষা নয়, কারণ মুখের ভাষা অঞ্চলভেদে পরিবর্তন হয়। তাই নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট এলাকার শিক্ষিত ও শিষ্টজনের মৌখিক ভাষাকে মান চলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকা এবং কলকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষাটিকে অল্প-বিস্তর পরিমার্জিত করে একটি সর্বজনবোধ্য আদর্শ কথ্য ভাষা গড়ে তোলা হয়। এটাই হলো বাংলার আদর্শ চলিত ভাষা। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। চলিত ভাষা বর্তমানে একাধারে লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা।

মূলত যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়, তাকে চলিত ভাষা বলে। যেমন : তারা খেলছে। ওরা ঘুমিয়ে রয়েছে।

প্রধানত ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের পার্থক্য বিবেচনা করেই সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা নিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : 'তাহারা পড়িতেছে'— বাক্যটিতে দুটি পদ আছে। 'তাহারা' সর্বনাম পদ এবং 'পড়িতেছে' ক্রিয়াপদ। সাধু ভাষার উল্লিখিত পদ দুটোতে সর্বনাম পদ ও ক্রিয়াপদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবার বাক্যটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করলে তার রূপ দাঁড়াবে 'তারা পড়ছে'।এ ক্ষেত্রে বাক্যটিতে 'তারা' সর্বনাম পদ এবং 'পড়ছে' ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ : করিতেছি, খাইয়াছি, বলিতেছি, যাইতেছি, পড়িতেছি, দেখিতেছি ইত্যাদি।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ : করছি, খেয়েছি, বলছি, যাচ্ছি, পড়ছি, দেখছি ইত্যাদি।

সাধু ভাষার সর্বনাম পদ : তাহার, তাহারা, তাহাদের, উহাদের ইত্যাদি।

চলিত ভাষার সর্বনাম পদ : তার, তারা, তাদের, ওদের ইত্যাদি।

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের কতিপয় রূপ :

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
করিব	করব
পড়িব	পড়ব
লিখিব	লিখব
করিতেছিলাম	করছিলাম
পড়িতেছিলাম	পড়ছিলাম
লিখিয়াছি	লিখেছি
করিয়াছি	করেছি
পড়িয়াছি	পড়েছি
পড়িতে থাকিব	পড়তে থাকব

করিতেছি	করছি
করিলাম	করলাম
খাইতেছে	খাচ্ছে
হইত	হতো
খাইবে	খাবে
যাইবে	যাবে
বলিব	বলব
করিলে	করলে
যাইও	যেয়ো/যেও
খাইও	খেয়ো/ খেও
লইব	নেব
করিতাম	করতাম
হইয়া	হয়ে

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের কতিপয় রূপ :

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
তাহার	তার
তাহাদের	তাদের
তাহাতে	তাতে
তাহারা	তারা
তাহাকে	তাকে
ইহারা	এরা
ইহাদের	এদের
উহারা	ওরা
উহাদের	ওদের
উহা	ও
এই	এ
ইহা	এটি
ইহাকে	একে
কাহার	কার
যাহা	যা

যাহারা	যারা
ইহার	এর
কাহাকে	কাকে
যাহাকে	যাকে

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা নানা দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এ উভয় ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো :

সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য

১. সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন : করিয়াছি, গিয়াছি।

২. সাধু ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন : তাহার, তাহারা, তাহাদের।

৩. সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হইতে, দিয়া।

৪. সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের (সংস্কৃত শব্দ) প্রয়োগ বেশি। যেমন : হস্ত, মস্তক, ঘৃত, ধৌত।

৫. সাধু ভাষার উচ্চারণ গুরুগম্ভীর।

৬. সাধু ভাষা সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী। এর কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়।

৭. সাধু ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের অনুপযোগী।

চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য

১. চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন : করেছি, গিয়েছি।

২. চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন : তারা, তাদের।

৩. চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হতে, দিয়ে।

৪. চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন : হাত, মাথা, ঘি, ধোয়া।

৫. চলিত ভাষার উচ্চারণ হালকা ও গতিশীল।

৬. চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।

৭. চলিত ভাষা চটুল, জীবন্ত ও লোকায়ত।

সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য

সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে এ ভাষারীতির পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। নিচে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন : করিয়াছি, গিয়াছি।	চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন: করেছি, গিয়েছি।
সাধু ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন: তাহার, তাহারা, তাহাদের।	চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন : তার, তারা, তাদের।
সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের (সংস্কৃত শব্দ) প্রয়োগ বেশি। যেমন : হস্ত, মস্তক, ঘৃত, ধৌত।	চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন : হাত, মাথা, ঘি, ধোয়া।
সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হইতে, দিয়া।	চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হতে, দিয়ে।
সাধু ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের অনুপযোগী।	চলিত ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের উপযোগী।
সাধু ভাষা মার্জিত।	চলিত ভাষা চটুল, জীবন্ত ও লোকায়ত।

সাধু ও চলিত ভাষার নমুনা

সাধু ভাষার নমুনা

১. বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করা, তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না এবং বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। [বোধোদয় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২. যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। [সাহিত্যের সামগ্রী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

চলিত ভাষার নমুনা

১. আমাদের মনে হয় এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। [বই পড়া : প্রমথ চৌধুরী]

২. বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়।

তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন দৃষ্টান্ত আর নেই।

[জীবন ও বৃক্ষ : মোতাহের হোসেন চৌধুরী]

ভাষারীতির পরিবর্তন

(ক) সাধু থেকে চলিত

সাধুরীতি	চলিতরীতি
পথে এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।	পথে এক যুবকের সঙ্গে তার দেখা হলো।
গফুর চুপ করিয়া রহিল।	গফুর চুপ করে রইল।
পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।	পাকা দুক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে বিদ্যা অর্জন করতে যাই।
আমি ব্যাপারটি বুঝিয়া আমার বিছানা গুটাইয়া লইয়া তাহাদের স্থান করিয়া দিলাম।	আমি ব্যাপারটা বুঝে আমার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে তাদের জায়গা করে দিলাম।
আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।	আমিনা ঘর হতে দুয়ারে এসে দাঁড়াল।

(খ) চলিত থেকে সাধু

চলিতরীতি	সাধুরীতি
চেয়ে দেখি, আমাদের রহমতকে দু পাহারাওয়ালা বেঁধে নিয়ে আসছে।	চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে।
হাজার বছর ধরে মানুষ এদের দেখছে।	হাজার বছর ধরিয়া মানুষ ইহাদের দেখিতেছে।
পাশেই কিছু দূরে একটা শালুক দেখতে পায় ওসমান।	পার্শ্বেই কিছু দূরে একটি শালুক দেখিতে পায় ওসমান।
আমাদের এ ভীরুতা কি চিরদিনই থেকে যাবে?	আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে?
এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন।	এই কথা শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিবেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। **বাংলা ভাষার উৎসমূল কোন ভাষা?**
ক. আর্য ভাষা
খ. সংস্কৃত মূল ভাষা
গ. ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা
ঘ. গৌড়ীয় বঙ্গ ভাষা

২। **নিচের কোন বাক্যটি সাধু ভাষার উদাহরণ?**
ক. আমি আজ বাড়ি যাব।
খ. আমি আজ সুস্থবোধ করিতেছি।
গ. আমি আজ বই মেলায় যাব।
ঘ. তাকে আমার খুব প্রয়োজন।

৩। **চলতি ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো-**
i. ক্রিয়া পদের রূপ সংক্ষিপ্ত হয়।
ii. সর্বনাম পদের রূপ সংক্ষিপ্ত হয়।
iii. উচ্চারণ খুবই গুরুগম্ভীর।

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i ii ও iii

কর্ম-অনুশীলন

১। ভাব প্রকাশ, অর্থবহতা, বাগ-যন্ত্র–এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে ভাষার একটি সংজ্ঞা তৈরি কর।

৪। প্রদত্ত শব্দগুলোর পরিবর্তিত রূপ ডান পাশের সঠিক ঘরে বসাও : কাহাকে, যার, উহাদের, করিলাম, চেনা, গ্রামা, পূজা, বরং, তথাপি, হচ্ছে।

প্রদত্ত শব্দ	সাধু	চলিত

২. ব্যাকরণ

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের শাস্ত্র। ভাষা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয় এবং বিভিন্ন রীতিতে ব্যবহৃত হয়। গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভাষারই নিজস্ব কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। এ নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হলে ভাষার বিভিন্ন উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রণালির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভাষার এ স্বরূপ বিশ্লেষণই 'ব্যাকরণ' নামে অভিহিত।

ব্যাকরণ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই— বি (বিশেষ) + আ (সম্যক) + √কৃ+ অন = ব্যাকরণ। এ বিশ্লিষ্ট অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে 'ব্যাকরণ' হচ্ছে 'শব্দ ব্যুৎপাদক ও ভাষা নিয়ামক শাস্ত্র।' ব্যাপকভাবে বলা যায়, ব্যাকরণ হচ্ছে 'ভাষার উচ্ছৃঙ্খলা নিবারক, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-নির্ধারক, পদ-সাধক এবং বাক্য রচনা প্রণালি নির্ধারক শাস্ত্র।' ব্যাকরণের কাজ ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা। ভাষার গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব কিছু নিয়মরীতি আছে। এসব নিয়মরীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে ভাষাকে ভেঙে তার উপাদানসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রণালি নির্ণয় করা প্রয়োজন। সুতরাং '**যে শাস্ত্রের দ্বারা ভাষাকে বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, তার নাম ব্যাকরণ।**' এ পর্যায়ে ব্যাকরণ সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা ভাষাপণ্ডিতের মন্তব্য নিচে উদ্ধৃত হলো :

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার গঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে। ব্যাকরণ সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন: যে বইয়ে ভাষার বিচার ও বিশ্লেষণ আছে, তা-ই ব্যাকরণ। মুনীর চৌধুরী বলেছেন: যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা। এ ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক বা গঠনগত নিয়মশৃঙ্খলা রয়েছে। সুতরাং 'যে পুস্তকে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তা-ই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।'

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ভাষাকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা থেকেই ব্যাকরণের উদ্ভব। লক্ষণীয় যে আগে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, পরে ভাষা বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাষা বহতা নদীর মতো গতিশীল। নিজের খেয়াল-খুশিমতো আপন গতিতে ভাষা এগিয়ে চলে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাষার মধ্যে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষার গতিবিধি লক্ষ করা এবং ভাষাকে বিশ্লেষণ করা। ভাষার মৌলিক উপাদান ধ্বনি, শব্দ, বাক্য—এগুলোর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের জন্য ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়। ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, তবু ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যাকরণ পাঠ এ জন্য প্রয়োজন যে—

১. ব্যাকরণ ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে নিরূপণ করে।

২. ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি এবং সে সবের সুষ্ঠ ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে জানা যায়।

৩. ব্যাকরণ পাঠ করে লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগে শুদ্ধতা রক্ষা করা যায়।

৪. ব্যাকরণ পাঠে ভাষার সৌন্দর্য অনুধাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫. ব্যাকরণ সাহিত্যের রস আস্বাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৬. ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে ছন্দ-অলংকার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।

৭. ভাষার পরিবর্তনের ধারা, নিয়ম-শৃঙ্খলার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ব্যাকরণ পাঠে অবহিত হওয়া যায়।

সুতরাং ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ —ভাষার চারটি মৌলিক উপাদান। এই উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করেই সব ভাষার ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলা ব্যাকরণও এর ব্যতিক্রম নয়।

১. **ধ্বনিতত্ত্ব** (Phonetics),
২. **শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব** (Morphology),
৩. **বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম** (Syntax) ও
৪. **অর্থতত্ত্ব** (Semantics)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। **ব্যাকরণকে ভাষার কী বলা হয়?**

ক. অভিভাবক
খ. সংবিধান
গ. উপাদান
ঘ. গাইড

৩. ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি

ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে তার যে অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায়, তা-ই ধ্বনি। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সহায়তায় উচ্চারিত ধ্বনি থেকেই ভাষার সৃষ্টি। বস্তুত ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে চারটি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলো হলো—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ। মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য 'কথা' বলে। মানুষের 'কথা' হলো অর্থযুক্ত কিছু ধ্বনি। ব্যাকরণ শাস্ত্রে মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ বা আওয়াজকেই ধ্বনি বলা হয়। বস্তুত অর্থবোধক ধ্বনিসমূহই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি। ধ্বনিই ভাষার মূল ভিত্তি।

ধ্বনি নির্গত হয় মুখ দিয়ে। ধ্বনি উৎপাদনে মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ প্রভৃতি বাক-প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হলেও ধ্বনি উৎপাদনের মূল উৎস হলো ফুসফুস। ফুসফুসের সাহায্যে আমরা শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে আসার সময় বিভিন্ন বাক্-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শে আসে। ফুসফুস থেকে বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় মুখের বিভিন্ন জায়গায় ঘষা খায়। এই ঘর্ষণের ফলে মুখে নানা ধরনের ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ফুসফুস নির্গত বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে মুখগহ্বরে প্রবেশের পর বিভিন্ন বাক্-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শে আঘাত লাগার দরুন ধ্বনি গঠিত বা তৈরি হয়। ধ্বনি গঠনে বিভিন্ন বাক- প্রত্যঙ্গের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

'ধ্বনি'র সাধারণ অর্থ যেকোনো ধরনের 'আওয়াজ'। কিন্তু ব্যাকরণে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনি দুই প্রকার। যেমন: ক. **স্বরধ্বনি** ও খ. **ব্যঞ্জনধ্বনি**।

বর্ণ

কোনো ভাষার ধ্বনিগুলোকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যে প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাকে বর্ণ বলে। অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বাংলা ভাষার একেকটি ধ্বনি-প্রতীক বা বর্ণ।

বর্ণমালা

কোনো ভাষার বর্ণসমষ্টির সুনির্দিষ্ট সাজানো ক্রমকে **বর্ণমালা** বলে। ধ্বনি যেমন দুই প্রকার—স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি; তেমনি এদের লিখিত প্রতীকও দুই প্রকার। যথা : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ

যেসব ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে পূর্ণ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়, তাকে **স্বরধ্বনি** বলে। আর এই স্বরধ্বনির প্রতীক বা লিখিত রূপই হচ্ছে স্বরবর্ণ। যেমন : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। স্বরবর্ণের সংখ্যা মোট ১১টি।

ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ

যেসব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে পূর্ণ বা স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। আর এই ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপই হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন : ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা মোট ৩৯টি।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও বৈশিষ্ট্য

ধ্বনি / বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুসারে নাম
অ, আ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্যধ্বনি
ই, ঈ	তালু	তালব্যধ্বনি
উ, ঊ	ঠোঁট বা ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি
ঋ	মূর্ধা	মূর্ধন্যধ্বনি
এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ্যতালব্যধ্বনি
ও, ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্যধ্বনি

উচ্চারণস্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগগুলোকে বর্গ বলে। প্রথম ধ্বনির নাম অনুসারে বর্গের নাম নির্দেশ করা হয়। যেমন :

ক বর্গ	ক খ গ ঘ ঙ
চ বর্গ	চ ছ জ ঝ ঞ
ট বর্গ	ট ঠ ড ঢ ণ
ত বর্গ	ত থ দ ধ ন
প বর্গ	প ফ ব ভ ম

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান ও বৈশিষ্ট্য

ধ্বনি / বর্ণ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় ধ্বনি
চ, ছ, জ, ঝ, শ	তালু	তালব্যধ্বনি
ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়	মূর্ধা	মূর্ধন্যধ্বনি
ত, থ, দ, ধ	দাঁত বা দন্ত	দন্ত্যধ্বনি
প, ফ, ব, ভ, ম	ঠোঁট বা ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি

কণ্ঠ্যধ্বনি

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান কণ্ঠনালির উপরিভাগ বা জিহ্বামূল, তাদের **কণ্ঠ্যধ্বনি** বলে। যেমন: অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ কণ্ঠ্যধ্বনির উদাহরণ।

তালব্যধ্বনি

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান তালু, তাদের **তালব্যধ্বনি** বলে। যেমন: চ, ছ, জ, ঝ, শ তালব্যধ্বনির উদাহরণ।

মূর্ধন্যধ্বনি

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান মূর্ধা বা তালুর অগ্রভাগ, তাদের **মূর্ধন্যধ্বনি** বলে। যেমন: ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়, মূর্ধন্যধ্বনির উদাহরণ।

দন্ত্যধ্বনি

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান দন্তমূল, তাদের **দন্ত্যধ্বনি** বলে। ত, থ, দ, ধ দন্ত্যধ্বনির উদাহরণ।

ওষ্ঠ্যধ্বনি

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, তাদের **ওষ্ঠ্যধ্বনি** বলে। উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্যধ্বনি ।

নাসিক্য বা অনুনাসিকধ্বনি

ঙ, ঞ, ণ, ন, ম—এগুলোর উচ্চারণকালে মুখবিবরের বাতাস নাক দিয়ে বের হয় বলে এগুলোকে **নাসিক্য বা অনুনাসিকধ্বনি** বলে।

অঘোষধ্বনি

প্রত্যেক বর্গের প্রথম দুটি ধ্বনি এবং শ, স এগুলোর উচ্চারণকালে আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ সৃষ্টি হয় না বলে, এগুলোকে **অঘোষধ্বনি** বলে। এদেরকে শ্বাসধ্বনিও বলা হয়।

ঘোষধ্বনি

বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি এবং হ এগুলোর উচ্চারণকালে আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ সৃষ্টি হয় বলে, এগুলোকে **ঘোষধ্বনি** বলে। ঘোষধ্বনিকে নাদধ্বনিও বলা হয়।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি

প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম ধ্বনির উচ্চারণকালে বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে বলে এদের **অল্পপ্রাণ ধ্বনি** বলে। যেমন : ক, গ, ঙ: চ, জ, ঞ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি

প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির উচ্চারণকালে বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে বলে এদের মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন : খ, ঘ; ছ, ঝ ইত্যাদি।

ধ্বনি-প্রকৃতি	অল্পপ্রাণ ধ্বনি	মহাপ্রাণ ধ্বনি
অঘোষ	ক চ ট ত প	খ ছ ঠ থ ফ
ঘোষ	গ জ ড দ ব ঙ ঞ ণ ন ম	ঘ ঝ ঢ ধ ভ

পরাশ্রয়ী ধ্বনি

'ং' (অনুস্বার), 'ঃ' (বিসর্গ) এবং 'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু) এই ধ্বনি তিনটি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হতে পারে না বলে এদের **পরাশ্রয়ী ধ্বনি** বলে। এদের অযোগবহ ধ্বনিও বলে।

অ্যা ধ্বনির উচ্চারণ

উচ্চারণ একটি বাচনিক প্রক্রিয়া। ভাষায় উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষিত না হলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মনের ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। দুভাবে ধ্বনি বা ভাষাকে প্রকাশ করা যায়। এক. মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে; দুই. লিখে। মনের ভাব লিখে কিংবা উচ্চারণ করে যেভাবেই প্রকাশ করা হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথার্থ বানান ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ অপরিহার্য। শুদ্ধ উচ্চারণ সঠিক মনোভাব প্রকাশের সহায়ক। পক্ষান্তরে, অশুদ্ধ উচ্চারণ শব্দের অর্থবিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটায়। তাই শুদ্ধ উচ্চারণের গুরুত্ব অপরিসীম। শুদ্ধ উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রমিত কথ্য ভাষার বাচনভঙ্গির অনুসরণ প্রয়োজন। সেইসাথে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক। এ ছাড়াও ভাষা ব্যবহারে আঞ্চলিকতা পরিহার করা এবং উচ্চারণসূত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা দরকার।

মনে রাখা প্রয়োজন প্রতিটি ধ্বনি-প্রতীকের নিজস্ব উচ্চারণ ও ধ্বনিগাম্ভীর্য রয়েছে। উল্লেখ্য, একাধিক ধ্বনি মিলে যখন শব্দ তৈরি হয়, তখন ধ্বনি-প্রতীকের উচ্চারণ কোথাও অপরিবর্তিত থাকে আবার কোথাও পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়ে যায়। নিচে অ্যা ধ্বনির উচ্চারণরীতি উল্লেখ করা হলো।

বাংলা বর্ণমালায় বর্তমানে ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১টি। এগুলো হলো : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

প্রমিত বাংলা উচ্চারণে মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি। এগুলো হলো : ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ। বাংলা মুখের ভাষায় স্বরধ্বনি অ্যা-ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও এই বর্ণের জন্য পৃথক কোনো বর্ণচিহ্ন বাংলা বর্ণমালায় নেই।

অ্যা ধ্বনির উচ্চারণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'অ্যা' ধ্বনির কোনো স্বতন্ত্র ধ্বনি-চিহ্ন নেই। কয়েকটি ক্ষেত্রে আ ধ্বনির উচ্চারণ অ্যা হয়।

১. শব্দের শুরুতে যুক্ত ব্যঞ্জনের জ্ঞ আ-কার থাকলে : জ্ঞাত [গ্যাঁতো] জ্ঞান [গ্যাঁন/গ্যান] জ্ঞাপন [গ্যাঁপন]।

২. য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে আ-কার বা আ-ধ্বনির উচ্চারণ প্রায় ক্ষেত্রেই অ্যা হয়। যেমন :

খ্যাতি [খ্যাতি]   ব্যাপার [ব্যাপার]

ত্যাগ [ত্যাগ্]   ব্যাকরণ [ব্যাকরোন্]

লক্ষণীয় শব্দের মধ্যে জ্ঞা থাকলে আ–ধ্বনি কখনো অ্যা, কখনো আ উচ্চারিত হয়। যেমন : বিজ্ঞান [বিগ্‌গ্যাঁন/বিগ্‌গাঁন্]

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?

ক. ১১ টি

খ. ২৫ টি

গ. ৩৯ টি

ঘ. ৫০ টি

২। নিচের কোন বর্ণগুলো কণ্ঠধ্বনির উদাহরণ?

ক. অ, আ, ক, খ

খ. ই, ঈ, চ, ছ

গ. উ, ঊ, প, ফ

ঘ. ত, থ, দ, ধ

কর্ম-অনুশীলন

নিচের ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ধ্বনি	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ		
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ		
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ড়, ঢ়, ষ		
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স		
প, ফ, ব, ভ, ম		

৪. সন্ধি

নিচের বাক্যটি লক্ষ কর—

গ্রাম-বাংলায় এখন চাষিদের ঘরে ঘরে **নবান্ন**।

উপরের বাক্যের 'নবান্ন' শব্দটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে পাশাপাশি অবস্থিত 'নব' এবং 'অন্ন' এ দুটি শব্দ দ্রুত উচ্চারণের ফলে তৈরি হয়েছে 'নবান্ন' শব্দটি। এ ক্ষেত্রে 'নব' শব্দের শেষে নিহিত 'অ' ধ্বনি এবং 'অন্ন' শব্দের প্রথমে অবস্থিত 'অ' ধ্বনি উভয়ে মিলে 'আ' ধ্বনি হয়েছে। যেমন :

নব + অন্ন = নবান্ন। (অ + অ = আ)

লক্ষণীয় যে আমরা যখন কথা বলি, তখন অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শব্দের ধ্বনি মিলে এক হয়ে যায় কিংবা একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনি বদলে যায় বা লোপ পায়। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনির এই মিলন, পরিবর্তন বা বিলোপই সন্ধি নামে পরিচিত।

বস্তুত, 'সন্ধি' শব্দের অর্থ মিলন। এটি ধ্বনি পরিবর্তনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া—ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলনজাত প্রক্রিয়া।

সন্ধি বা ধ্বনির মিলন নানাভাবে হতে পারে। যেমন :

১. দুটি ধ্বনির আংশিক বা পূর্ণমিলন। যেমন : শত + অধিক = শতাধিক [অ + অ = আ]

২. পূর্বধ্বনি বা পরধ্বনি লোপ। যেমন : নিঃ + চয় = নিশ্চয় [ঃ + চ = শ্চ]

সংজ্ঞা : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।

অথবা, পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন বা বিলুপ্তিকে সন্ধি বলে।

— ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, একাধিক ধ্বনির মিলন, লোপ বা পরিবর্তনের নাম সন্ধি।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি দ্রুত উচ্চারণের সময় সন্ধির ফলে উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং উচ্চারণ সহজতর হয়। সন্ধি ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে। যেমন : 'নব' 'অন্ন' উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন— 'নবান্ন' উচ্চারণে তার চেয়ে কম সময় লাগে। এ ছাড়া 'নব' 'অন্ন' বলতে যে ধরনের উচ্চারণ-শ্রম প্রয়োজন, 'নবান্ন' তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত হয়। কেবল তা-ই নয়— আলাদাভাবে 'নব' 'অন্ন' উচ্চারণের চেয়ে একসঙ্গে 'নবান্ন' উচ্চারণ অনেক বেশি শ্রুতিমধুর। অর্থাৎ সন্ধি ভাষার ধ্বনিগত মাধুর্যও সম্পাদন করে। সন্ধির ফলে নতুন নতুন শব্দও তৈরি হয়। শুদ্ধ বানান লিখতেও সন্ধি সহায়তা করে। সুতরাং উল্লিখিত দিকগুলো বিবেচনায় বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সন্ধির প্রকারভেদ

১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে **স্বরসন্ধি** বলে। যেমন :

নব + অন্ন = নবান্ন অ + অ = আ
হিম + আলয় = হিমালয় অ + আ = আ

২. ব্যঞ্জনসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির, ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে **ব্যঞ্জনসন্ধি** বলে। যেমন :

উৎ + চারণ = উচ্চারণ (ত্ + চ = চ্চ)
সৎ + জন = সজ্জন (ত্ + জ = জ্জ)

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গসন্ধি বলে ব্যঞ্জনসন্ধির একটি প্রকারভেদ আছে। বিসর্গ (ঃ) হচ্ছে 'র' এবং 'স'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন :

আবিঃ + কার = আবিষ্কার [ঃ + ক = ষ্ক]

কখনো কখনো বিসর্গসন্ধিকে ভিন্ন একটি শ্রেণিতে ফেলে সন্ধিকে তিন প্রকার বলা হয়। যেহেতু 'ঃ' (বিসর্গ) ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্গত, সেহেতু বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্ভুক্ত।

ব্যঞ্জনে-স্বরে সন্ধি

নিয়ম-১ : বর্গের প্রথম ব্যঞ্জনের (ক্ / চ্ / ট্ / ত্ / প্) পরে স্বরধ্বনি থাকলে বর্গের প্রথম ব্যঞ্জনস্থলে তৃতীয় ব্যঞ্জন (গ্ / জ্ / ড্ / দ্ / ব্) হয়। যেমন :

ক্ + স্বরধ্বনি = গ্ + স্বরধ্বনি : দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।
বাক্ + অর্থ = বাগর্থ।
প্রাক্ + উক্ত = প্রাগুক্ত।
বাক্ + ঈশ = বাগীশ।

চ্ + স্বরধ্বনি = জ্ + স্বরধ্বনি : ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত।
অচ্ + অন্তা = অজন্তা।

ট্ + স্বরধ্বনি = ড্ (ড়) + স্বরধ্বনি :	ষট্ + আনন = ষড়ানন।
	ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু।
ত্ + স্বরধ্বনি = দ্ + স্বরধ্বনি :	তৎ + অন্ত = তদন্ত।
	কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত।
	সৎ + ইচ্ছা = সদিচ্ছা।
প্ + স্বরধ্বনি = ব্ + স্বরধ্বনি :	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

স্বরে-ব্যঞ্জনে সন্ধি

নিয়ম-২ : স্বরধ্বনির পরে ছ্ থাকলে ছ্ স্থানে চ্ছ হয়। যেমন :

অ + ছ্ = অচ্ছ্	এক + ছত্র = একচ্ছত্র।	স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ।
	অঙ্গ+ছেদ = অঙ্গচ্ছেদ।	প্র + ছদ = প্রচ্ছদ।
	মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি।	বৃক্ষ+ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া।
আ + ছ্ = আচ্ছ্	আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন।	কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।
	আ + ছাদন = আচ্ছাদন।	পরীক্ষা + ছলে = পরীক্ষাচ্ছলে।
ই + ছ্ = ইচ্ছ্	পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।	প্রতি + ছবি = প্রতিচ্ছবি।
	পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন।	

ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সন্ধি

নিয়ম-৩ : ত্ [ৎ] কিংবা দ্-এর পরে চ্ কিংবা ছ্ থাকলে ত্ বা দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন :

ত্ + চ্ = চ্চ	উৎ + চারণ = উচ্চারণ।	চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র।
দ্ + চ্ = চ্চ	বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা।	তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র।
ত্ + ছ্ = চ্ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।	চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি।
দ্ + ছ্ = চ্ছ	তদ্ + ছবি = তচ্ছবি।	উদ্ + ছেদ = উচ্ছেদ।

নিয়ম-৪ : ত্ [ৎ] কিংবা দ্ -এর পরে জ্ কিংবা ঝ্ থাকলে সন্ধিতে দুয়ে মিলে জ্জ বা জ্ঝ হয়। যেমন :

ত্ + জ্ = জ্জ উৎ + জীবন = উজ্জীবন। উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল।

সৎ + জন = সজ্জন। তৎ + জন্য = তজ্জন্য।

অনুরূপ : উজ্জীবিত, যাবজ্জীবন, কজ্জল, জগজ্জীবন।

দ্ + জ্ = জ্জ বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক।

তদ্ + জাতীয় = তজ্জাতীয়।

ত্ + ঝ্ = জ্ঝ কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

নিয়ম-৫ : ত্ [ৎ] কিংবা দ্ -এর পরে ড্ কিংবা ঢ্ থাকলে ত্ বা দ্ স্থানে ড্ হয়। যেমন :

ত্ + ড্ = ড্ড উৎ + ডীন = উড্ডীন। উৎ + ডীয়মান = উড্ডীয়মান।

দ্ + ঢ = ড্ঢ এতদ্ + ঢক্কা = এতড্ঢক্কা।

ত্ + শ্ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস। উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল। উৎ + শল = উচ্ছল

নিয়ম-১০ : ত্ [ৎ] কিংবা দ্ -এর পরে হ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে দ্ হয় এবং হ্ স্থানে ধ হয় এবং দুয়ে মিলে দ্ধ (দ্ + ধ) হয়। যেমন :

ত্ + হ্ = দ্ + ধ্ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার। উৎ + হত = উদ্ধত উৎ + হৃত = উদ্ধৃত।

দ্ + হ্ = দ্ধ তদ্ + হিত = তদ্ধিত। পদ্ + হতি = পদ্ধতি।

নিয়ম-১১ : ন্ কিংবা ম্ পরে থাকলে বর্গের প্রথম ধ্বনি সন্ধিতে পঞ্চম ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন :

ক্ > ঙ্ দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্‌নির্ণয়। বাক্ + ময় = বাঙ্ময়।

ট্ > ণ্ ষট্ + মাস = ষণ্মাস।

ত্ > ন্ উৎ + নয়ন = উন্নয়ন। চিৎ + ময় = চিন্ময়। মৃৎ + ময় = মৃন্ময়।

নিয়ম–১২ : আগে ম্ এবং পরে ক্ / খ্ / গ্ / ঘ্ –এর যেকোনোটি থাকলে সন্ধিতে ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) বা উয়ো (ঙ) হয়। যেমন :

ম্ + ক্ = ং ক্ /ঙ ক

অলম্ + কার = অলংকার/ অলঙ্কার। অহম্ + কার = অহংকার/অহঙ্কার।

সম্ + কলন = সংকলন/ সঙ্কলন। সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ /সঙ্কীর্ণ।

ম্ + গ্ = ংগ /ঙ্গ সম্ + গত = সংগত/ সঙ্গত। সম্ + গীত = সংগীত/ সঙ্গীত।

ম্ + ঘ্ = ংঘ/ ঙ্ঘ সম্ + ঘ = সংঘ / সঙ্ঘ। সম্ + ঘাত = সংঘাত /সঙ্ঘাত।

নিয়ম-১৩ : আগে ম্ এবং পরে চ্ থেকে ম্ পর্যন্ত বর্গীয় ধ্বনির যেকোনোটি থাকলে পূর্বপদের ম্ স্থানে পরবর্তী বর্গীয় ধ্বনির পঞ্চম ধ্বনি হয়। যেমন :

ম্ + চ্ = ঞ্চ সম্ + চয় = সঞ্চয়। কিম্ + চিৎ = কিঞ্চিৎ।

ম্ + ত্ = ন্ত সম্ + তাপ = সন্তাপ। সম্ + ত্রাস = সন্ত্রাস।

গম্ + তব্য = গন্তব্য। কিম্ + তু = কিন্তু।

ম্ + দ্ = ন্দ সম্ + দর্শন = সন্দর্শন।

ম্ + ধ্ = ন্ধ সম্ + ধান = সন্ধান। সম্ + ধি = সন্ধি।

ম্ + ন্ = ন্ন সম্ + নিহিত = সন্নিহিত। সম্ + নিবেশ = সন্নিবেশ।

কিম্ + নর = কিন্নর। সম্ + ন্যাস = সন্ন্যাস।

ম্ + প্ = ম্প সম্ + পদ = সম্পদ। সম্ + প্রীতি = সম্প্রীতি

সম্ + প্রতি = সম্প্রতি। সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ। সম্ + পূরক = সম্পূরক।

ম্ + ব্ = ম্ব সম্ + বল = সম্বল। সম্ + বোধন = সম্বোধন।

জ্ঞাতব্য : কখনো কখনো ম্ -এর পরে ব্ থাকলে ম্ স্থানে ং হয়। যেমন :

ম্ + ব্ = ং সম্ + বাদ = সংবাদ। সম্ + বিৎ = সংবিৎ। সম্ + বরণ = সংবরণ।

সম্ + বিধান = সংবিধান। সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা। কিম্ + বা = কিংবা।

নিয়ম-১৪ : আগে ম্ এবং পরে অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন (য্/র্/ল্/ব্) কিংবা উষ্মধ্বনির (শ্ / স্ /হ্) যেকোনোটি থাকলে পূর্বপদের ম্ স্থানে ং (অনুস্বার) হয়। যেমন :

ম্ + য্ = ংয সম্ + যত = সংযত। সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত।

ম্ + র্ = ংর সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ। সম্ + রক্ষিত = সংরক্ষিত।

ম্ + ল্ = ংল সম্ + লাপ = সংলাপ। সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন।

ম্ + ব্ = ংব সম্ + বরণ = সংবরণ। সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা।

সম্ + বাদ = সংবাদ। সম্ + বিধান = সংবিধান।

ম্ + শ্ = ংশ সম্ + শয় = সংশয়। সম্ + শ্লেষ = সংশ্লেষ।

সম্ + শোধন = সংশোধন। সম্ + শ্লিষ্ট = সংশ্লিষ্ট।

ম্ + স্ = ংস সম্ + সার = সংসার। সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা।

ম্ + হ্ = ংহ সম্ + হত = সংহত। সম্ + হার = সংহার।

সম্ + হতি = সংহতি। সম্ + হিতা = সংহিতা।

নিয়ম–১৫ : চ বর্গের ধ্বনির পরে ন্ থাকলে সন্ধিতে ন্-এর স্থলে ঞ হয়। যেমন :

চ্ + ন্ = চঞ যাচ্ + না = যাঞ্চা।

জ্ + ন্ = জঞ রাজ্ + নী = রাজ্ঞী।

নিয়ম-১৬ : ষ্ –এর পরে ত্ কিংবা থ্ থাকলে ত-এর স্থলে ট্ এবং থ্-এর স্থলে ঠ্ হয়। যেমন :

ষ্ + ত্ = ত্ > ট্ নশ্ + ত = নষ্ট বৃষ্ + তি = বৃষ্টি।

সৃজ্ + তি = সৃষ্টি। কৃষ্ + তি = কৃষ্টি।

ষ্ + থ্ = থ্ > ঠ্ ষষ্ + থ = ষষ্ঠ।

নিয়ম–১৭ : ম্-এর পরে কৃ ধাতু নিষ্পন্ন 'কৃত', 'কার', 'করণ', 'কৃতি' ইত্যাদি শব্দ থাকলে ম্ স্থানে ং হয়, এবং স্ ধ্বনির আগম হয়। যেমন :

ম্ + কৃত = ং + স্ সম্ + কৃত = সংস্কৃত।

ম্ + কার = ং + স্ সম্ + কার = সংস্কার।

ম্ + করণ = ং + স্ সম্ + করণ = সংস্করণ।

ম্ + কৃতি = ং + স সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি।

নিয়ম-১৮ : উষ্মবর্ণ (শ স হ) পরে থাকলে পূর্বপদের শেষে অবস্থিত ন্ ধ্বনি ং-এ পরিবর্তিত হয়। যেমন:

ন্ + স্ = ং হিন্ + সা = হিংসা। দন্ + শন = দংশন।

সিন্ + হ = সিংহ।

২০২৫

ব্যঞ্জনসন্ধিঘটিত শব্দের উদাহরণ

ব্যঞ্জনসন্ধি

অনুচ্ছেদ = অনু + ছেদ।	অহংকার = অহম্ + কার।	উল্লাস = উৎ + লাস।
উদ্ধার = উৎ + হার।	উচ্চারণ = উৎ + চারণ।	উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল।
উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস।	উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল।	উল্লেখ = উৎ + লেখ।
উদ্ঘাটন = উৎ + ঘাটন।	উদ্যোগ = উৎ + যোগ।	উদ্দাম = উৎ + দাম।
উন্নত = উৎ + নত।	উন্নয়ন = উৎ + নয়ন।	কৃষ্টি = কৃষ্ + তি।
কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা।	চলচ্ছবি = চলৎ + ছবি।	চিন্ময় = চিৎ + ময়।
জগদীশ = জগৎ + ঈশ।	জগন্নাথ = জগৎ + নাথ।	জগন্ময় = জগৎ + ময়।
ণিজন্ত = ণিচ্ + অন্ত।	তৎকাল = তদ্ + কাল।	তৎসম = তদ্ + সম।
তদ্ধিত = তদ্ + হিত।	তন্মধ্যে = তৎ + মধ্যে।	দিগন্ত = দিক্ + অন্ত।
দিগ্গজ = দিক্ + গজ।	দ্যুলোক = দিব + লোক।	পরিচ্ছদ = পরি + ছদ।
পদ্ধতি = পদ্ + হতি।	প্রতিচ্ছবি = প্রতি + ছবি।	পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ।
বাঙ্ময় = বাক্ + ময়।	বনস্পতি = বন + পতি।	মৃন্ময় = মৃৎ + ময়।
যাচ্ঞা = যাচ্ + না।	রাজ্ঞী = রাজ্ + নী।	ষষ্ঠ = ষষ্ + থ।
ষড়ৃতু = ষট্ + ঋতু।	ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র।	ষণ্মাস = ষট্ + মাস।
ষোড়শ = ষট্ + দশ।	সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র।	সজ্জন = সৎ + জন।
সঞ্চয় = সম্ + চয়।	সংবাদ = সম্ + বাদ।	সংগীত = সম্ + গীত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। নিচের কোনটি সঠিক সন্ধি?

ক. রাজা + নী = রাজ্ঞী

খ. বৃষ + তি = বৃষ্টি

গ. সিং + হ = সিংহ

ঘ. উৎ + লাস = উল্লাস

২। সন্ধি শব্দের অর্থ-

ক. সংযোগ

খ. সমাধান

গ. মিলন

ঘ. শান্তি

কর্ম-অনুশীলন

১। সন্ধির সংজ্ঞা এবং সন্ধির প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন প্রকার সন্ধির পরিচয় একটি পোস্টার পেপারে সুন্দর করে সাজিয়ে লেখ।

২। ছক অনুযায়ী নিচের শব্দগুলোর সন্ধি বিশ্লেষণ কর এবং সন্ধির নিয়ম লেখ :

শব্দ	সন্ধি-বিশ্লেষণ	সন্ধির নিয়ম
নবান্ন		
শুভেচ্ছা		
দেবেন্দ্র		
নীলোৎপল		
মহোৎসব		
শীতার্ত		
হিতৈষী		
ইত্যাদি		

৩. সন্ধি কর :

জগৎ + নাথ = জগৎ + ময় = তদ্ + হিত =

দিক্ + অন্ত = দিক্ + গজ = দিন + লোক =

পরি + ছদ = পদ্ + হতি = বন + পতি =

মৃৎ + ময় = ষট্ + ঋতু = ষট্ + দশ =

সৎ + জন = সম্ + বাদ = সম্ + গীত =

৫. শব্দ ও পদ

কারক ও বিভক্তি

বাংলা ব্যাকরণে 'কারক' একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। 'কারক' শব্দটির অর্থ, যে কোনো কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যে কর্তাই ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং কর্তাই কারক এ রকম মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণে শুধু কর্তাই কারক নয়। কর্তা কী করছে, কার সাহায্যে করছে, কোথায় করছে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের অবলম্বন, উপকরণ, হেতু, স্থান, কাল ইত্যাদি সবকিছুই এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। ক্রিয়া সম্পাদনে ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির যে সম্পর্ক রয়েছে, ব্যাকরণে তা কারক নামে অভিহিত।

কারকের সংজ্ঞার্থ

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

কারকের প্রকারভেদ

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের ছয় প্রকারের সম্পর্ক হয়ে থাকে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক ছয় প্রকার। যেমন :

১. কর্তৃকারক,	২. কর্মকারক,	৩. করণ কারক,
৪. সম্প্রদান কারক,	৫. অপাদান কারক ও	৬. অধিকরণ কারক

নিচে একটি বাক্যের সাহায্যে এই সম্পর্কের সূত্রসমূহ দেখানো হলো :

'বাদশা নাসির উদ্দিন প্রত্যহ সকালে রাজকোষ হতে স্বহস্তে দরিদ্রদেরকে ধন দান করতেন।'

১. কে দান করতেন ? বাদশা নাসির উদ্দিন (কর্তৃকারক)

২. কী দান করতেন? ধন (কর্মকারক)

৩. কী দ্বারা দান করতেন? স্বহস্তে (করণ কারক)

৪. কাদের দান করতেন? দরিদ্রদের (সম্প্রদান কারক)

৫. কোথা হতে দান করতেন? রাজকোষ হতে (অপাদান কারক)

৬. কখন দান করতেন? প্রত্যহ সকালে (অধিকরণ কারক)

কারক নির্ণয়ের প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

১. ক্রিয়াকে 'কে' দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে কর্তৃকারক।

২. ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে কর্মকারক।

৩. ক্রিয়াকে 'কী দ্বারা' প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে করণ কারক।

৪. ক্রিয়াকে 'কাকে' (স্বত্বত্যাগ করে প্রদান) দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে সম্প্রদান কারক।

২০১৫

৫. ক্রিয়াকে 'কোথা হতে' প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে অপাদান কারক।

৬. ক্রিয়াকে 'কোথায়', 'কখন' দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে অধিকরণ কারক।

বিভক্তি

বাক্যের শব্দগুলোর নির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে। বিন্যাসই সমগ্র বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে দেয়। দেখা যায়, বাক্যের যথাযথ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য বাক্যস্থিত নাম শব্দগুলোর সঙ্গে কখনো কখনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে থাকে। এই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির নাম বিভক্তি। বাংলা বাক্যের পদগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক নির্দেশের জন্য এই বিভক্তিগুলোর সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় বিভক্তির প্রয়োজন পড়ে না। বিভক্তি না থাকলে শূন্য বিভক্তি (০) ধরে নিতে হয়। যেমন :

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।

এই বাক্যে তিনটি নাম শব্দ আছে সন্ধ্যা, আকাশ, চাঁদ। আর 'উঠেছে' হলো ক্রিয়াপদ। সমগ্র বাক্যটির অর্থগ্রাহ্যতার জন্য 'সন্ধ্যা' শব্দের সঙ্গে 'য়', 'আকাশ' শব্দের সঙ্গে 'এ' যুক্ত হয়েছে। 'য়', 'এ' হলো বিভক্তি। চাঁদ-এর সঙ্গে কোনো বর্ণ যুক্ত হয়নি প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু ব্যাকরণমতে, সেখানেও বিভক্তি আছে, তবে তা শূন্য (০) বিভক্তি। শূন্য (০) বিভক্তিকে অ-বিভক্তিও বলা হয়। সমগ্র বাক্যটির বিন্যাস এই রকম :

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।

সন্ধ্যা+য় আকাশ+এ চাঁদ+০ উঠেছে।

এই বাক্যের বিভক্ত অংশগুলোই (য়, এ, ০) বিভক্তি।

সংজ্ঞার্থ

বাক্যে ব্যবহৃত যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতায় সাহায্য করে, তাদের বিভক্তি বলা হয়।

বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা

বাংলায় এমন অনেক বাক্য রয়েছে, যেগুলোতে ক্রিয়াপদ নেই। যেমন :

মাঠে মাঠে অজস্র ফসল।

ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান।

এ জাতীয় ক্রিয়াহীন অনেক বাক্য বাংলায় রয়েছে। ক্রিয়া নেই বলে এই বাক্যগুলোর অন্তর্গত নাম শব্দগুলোর কারকও নেই। সে জন্য বলা হয় বাংলা বাক্য কারক-প্রধান নয়। কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য ঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না এবং বাক্যও অর্থগ্রাহ্য হয় না। ওপরের দুটি বাক্যের বিভক্তি তুলে নিলে বাক্যগুলো যথাযথ অর্থ প্রকাশ করবে না। 'মাঠ মাঠ অজস্র ফসল' কিংবা 'ছোট ছোট ডিঙি নৌকা নদী ভাসমান' বাক্য হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম বাক্যে 'এ' বিভক্তি (মাঠ+এ), দ্বিতীয় বাক্যে 'তে' বিভক্তি (নদী+তে) বাক্য দুটির বিন্যাস ও অর্থ ঠিক করে দিয়েছে। 'গাছের পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে' —এই বাক্যেও আমরা দেখছি এর বিভক্তি [গাছ+এর, রাত+এর] ও 'য়' বিভক্তি [পাতা+য়] বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অর্থগ্রাহ্য

করেছে। নতুবা 'গাছ পাতা রাত শিশির' কোনো বাক্য নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিভক্তি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ অর্থাৎ পদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট করে। সে জন্য বাংলা বাক্য বিভক্তি-প্রধান। এর থেকে বাংলা বাক্যে বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। অবশ্য সব সময় বিভক্তি দিয়ে বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশ করতে পারে না, সেসব ক্ষেত্রে বিভক্তির স্থানে বিভক্তি-স্থানীয় কিছু শব্দ যেমন 'দ্বারা', 'দিয়ে', 'কর্তৃক', 'হতে', 'থেকে', 'চেয়ে' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তির প্রকারভেদ

বিভক্তি দুই প্রকার। যথা :

১. শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি ও ২. ক্রিয়া বিভক্তি।

১. শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি

শব্দ বা নাম পদের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যুক্ত হয়, তাদেরকে শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি বলে। যেমন :

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। (ভিক্ষুক + কে)

২. ক্রিয়া বিভক্তি

ধাতু বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যুক্ত হয়, তাদেরকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। যেমন :

তিনি বাড়ি যাবেন (যা + ইবেন = যাইবেন/যা + বেন = যাবেন)।

শব্দ বিভক্তির সঙ্গে কারকের এবং ক্রিয়া বিভক্তির সঙ্গে কাল ও পুরুষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে।

শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি কারক নির্দেশ করে বলে এগুলোকে কারক বিভক্তিও বলা হয়। কারকভেদে শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যেমন : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

বাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই বিভক্তিহীন পদ পাওয়া যায়। এই অনুপস্থিত বিভক্তিকে বলা হয় শূন্য (০) বিভক্তি।

একবচন ও বহুবচনে কারক বিভক্তির রূপ :

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	শূন্য (০), অ, এ, (য়), তে	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ
দ্বিতীয়া	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগেরে, দেরে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগের দ্বারা, দের দ্বারা, দিগ কর্তৃক
চতুর্থী	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগেরে, দেরে
পঞ্চমী	হতে, থেকে, চেয়ে	দিগের হতে, দের হতে, দিগের চেয়ে
ষষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের, গুলির, গণের
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে	দিগে, দিগেতে, গুলিতে

১. কর্তৃকারক

পাখি ডাকে।

সে যায়।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

উল্লিখিত বাক্য তিনটিতে **ডাকে, যায়** এবং **খেয়েছে** ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াগুলো সম্পাদন করছে যথাক্রমে **পাখি, সে** এবং **বুলবুলি**। সুতরাং **পাখি, সে** এবং **বুলবুলি** কর্তৃকারক।

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তা বলে এবং ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃসম্বন্ধযুক্ত পদই কর্তৃকারক।

সংজ্ঞার্থ

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক চার প্রকার। যেমন :

ক. মুখ্যকর্তা : যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে, সে-ই মুখ্যকর্তা। যেমন :

ঘোড়া গাড়ি টানে।

মুষলধারে **বৃষ্টি** পড়ছে।

খ. প্রযোজক কর্তা : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে ক্রিয়া সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন : **মা** শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

এখানে 'মা' প্রযোজক কর্তা ।

গ. প্রযোজ্য কর্তা : মূল কর্তার করণীয় কাজ যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন :

মা **শিশুকে** চাঁদ দেখাচ্ছেন।

শিক্ষক **ছাত্রগণকে** পড়াচ্ছেন।

এখানে 'শিশু' এবং 'ছাত্রগণ' প্রযোজ্য কর্তা ।

ঘ. ব্যতিহার কর্তা : বাক্যের মধ্যে দুটি কর্তা যখন একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন :

সেয়ানে সেয়ানে লড়াই।

বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

প্রথমা বিভক্তি : **শিহাব** বই পড়ে।

দ্বিতীয়া বিভক্তি : **শিমুলকে** যেতে হবে।

তৃতীয়া বিভক্তি : **নজরুল কর্তৃক** অগ্নিবীণা রচিত হয়েছে।

ষষ্ঠী বিভক্তি : **আমার** খাওয়া হয় নি।

সপ্তমী বিভক্তি : **ছাগলে** কী না খায়।

২. কর্মকারক

ঘোড়া **গাড়ি** টানে। শাহেদ **বই** পড়ে।

সংজ্ঞা : যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে।

উল্লিখিত বাক্য দুটিতে 'ঘোড়া' এবং 'শাহেদ' যথাক্রমে 'গাড়ি' এবং 'বই'-কে আশ্রয় করে 'টানা' এবং 'পড়া' ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সুতরাং 'গাড়ি' এবং 'বই' কর্মকারক।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

প্রথমা বিভক্তি : **পুলিশ** ডাক।

দ্বিতীয়া বিভক্তি : আমি **তাকে** চিনি।

ষষ্ঠী বিভক্তি : ছেলেটি **বলের** সঙ্গে যুদ্ধ করে।

সপ্তমী বিভক্তি : জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।

৩. করণ কারক

'করণ' শব্দটির অর্থ যন্ত্র, সহায় বা উপায়। অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পত্তির ব্যাপারে যা প্রধান সহায়, তা-ই করণ।
সংজ্ঞা : কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। যেমন :
ছেলেরা **বল** খেলে। **বন্যায়** দেশ প্লাবিত হলো। কলমটি **সোনায়** মোড়া।
করণ কারকে সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

প্রথমা বিভক্তি : ছেলেরা **বল** খেলে।

তৃতীয়া বিভক্তি : আমরা **কান দ্বারা** শুনি।

পঞ্চমী বিভক্তি : এ **সন্তান হতে** দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।

ষষ্ঠী বিভক্তি : তার মাথায় **লাঠির** আঘাত কোরো না।

সপ্তমী বিভক্তি : আকাশ **মেঘে** ঢাকা।

৪. সম্প্রদান কারক

'সম্প্রদান' অর্থ স্বেচ্ছায় দান।

সংজ্ঞা : যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোনো কিছু দান করা হয়, সেই দান গ্রহীতাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন :

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। **অন্ধজনে** দেহ আলো। **বস্ত্রহীনে** বস্ত্র দাও।

কিন্তু 'স্বত্ব ত্যাগ' না বোঝালে সম্প্রদান কারক হবে না। যেমন : **ধোপাকে** কাপড় দাও।

এ ক্ষেত্রে 'ধোপা' সম্প্রদান কারক নয় কারণ 'ধোপাকে' কাপড় কখনোই স্বত্ব ত্যাগ করে দেওয়া হয় না।

জ্ঞাতব্য : সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলা ভাষায় সম্প্রদান কারকের ব্যবহার চলে আসছে। কিন্তু সম্প্রদান কারক এবং কর্মকারকের বিভক্তি চিহ্ন এক। কেবল দানের প্রসঙ্গে অনেক ব্যাকরণ-বিশেষজ্ঞ সম্প্রদান কারকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন।

সম্প্রদান কারকে সাধারণত চতুর্থী বিভক্তি হয়।

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

প্রথমা বিভক্তি : **গুরু** দক্ষিণা দাও।

চতুর্থী বিভক্তি : **দরিদ্রকে** দান কর।

ষষ্ঠী বিভক্তি : **ভিক্ষুকদের** ভিক্ষা দাও।

সপ্তমী বিভক্তি : **দীনে** দয়া কর।

৫. অপাদান কারক

সংজ্ঞা : যা থেকে কোনো কিছু বিচ্যুত, পতিত, গৃহীত, জাত, রক্ষিত, বিরত, দূরীভূত ও উৎপন্ন এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন :

বিচ্যুত : বৃক্ষ **থেকে** পাতা ঝরে।
পতিত : **মেঘে** বৃষ্টি হয়।
গৃহীত : **ঝিনুক থেকে** মুক্তা মেলে।
জাত : **জমি থেকে** ফসল পাই।
রক্ষিত : **বিপদে** মোরে রক্ষা কর।
বিরত : **পাপে** বিরত হও।
দূরীভূত : **দেশ থেকে বিপদ** চলে গেছে।
উৎপন্ন : **তিলে** তৈল হয়।
ভীত : **সুন্দরবনে** বাঘের ভয় আছে।

অপাদান কারকে সাধারণত পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

প্রথমা বিভক্তি	:	ট্রেনটি **ঢাকা** ছাড়ল।
দ্বিতীয়া বিভক্তি	:	**বাবাকে** বড্ড ভয় পাই।
তৃতীয়া বিভক্তি	:	তার **চোখ দিয়ে** পানি পড়ছে।
পঞ্চমী বিভক্তি	:	জেলেরা **নদী থেকে** মাছ ধরছে।
ষষ্ঠী বিভক্তি	:	**বাঘের** ভয়ে সকলে ভীত।
সপ্তমী বিভক্তি	:	**দুধে** দই হয়।

৬. অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা : যে স্থানে, যে কালে বা যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে ক্রিয়ার আধার বলে। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন :

বনে বাঘ থাকে। **বসন্তে** কোকিল ডাকে। তিনি **ব্যাকরণে** পণ্ডিত।

প্রকারভেদ

অর্থভেদে অধিকরণ কারক চার প্রকার। যেমন :

ক. স্থানাধিকরণ; খ. কালাধিকরণ; গ. বিষয়াধিকরণ ও ঘ. ভাবাধিকরণ।

ক. স্থানাধিকরণ : যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে স্থানাধিকরণ কারক বলে। যেমন : **জলে** কুমির থাকে।

খ. কালাধিকরণ : যে কালে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কালাধিকরণ কারক বলে। যেমন : **শরতে** শাপলা ফোটে।

গ. বিষয়াধিকরণ : কোনো বিষয়ে দক্ষতা বা অক্ষমতা প্রকাশে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে, তাকে বিষয়াধিকরণ কারক বলে। যেমন : তিনি **ইংরেজিতে** ভালো। শফিক **গণিতে** কাঁচা।

ঘ. ভাবাধিকরণ : একটি ক্রিয়া অন্য ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে নির্ভরশীল ক্রিয়াপদটি ভাববাচকে পরিণত হয়ে অধিকরণ হলে, তাকে ভাবাধিকরণ কারক বলে। যেমন : **সূর্যোদয়ে** অন্ধকার দূরীভূত হয়।

এ ক্ষেত্রে 'অন্ধকার দূরীভূত হওয়া' 'সূর্যোদয়ের' ওপর নির্ভরশীল। অতএব 'সূর্যোদয়ে' ভাবাধিকরণ কারক।

অনুরূপ : হাসিতে মুক্তা ঝরে।

অধিকরণ কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি হয়।

অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

প্রথমা বিভক্তি	:	আমি **আগামী কাল** বাড়ি যাব।
দ্বিতীয়া বিভক্তি	:	মন আমার নাচেরে **আজিকে।**
তৃতীয়া বিভক্তি	:	**খিলিপান দিয়ে** ঔষধটা খেয়ে নিও।
পঞ্চমী বিভক্তি	:	**ছাদ থেকে** নদী দেখা যায়।
সপ্তমী বিভক্তি	:	**বনে** বাঘ থাকে।

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য পদের যে সম্বন্ধ, তাকে কারক বলে। কিন্তু ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন : **রামের** ভাই ঢাকা যাবে।

এখানে 'রামের' সঙ্গে 'ভাইয়ের' সম্পর্ক আছে কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।

সুতরাং ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে সম্বন্ধ পদ কারক নয়।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

ক. সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী ('র' বা 'এর') বিভক্তি হয়। যেমন : সোনা + র = সোনার (থালা)। তারেক + এর = তারেকের (ভাই)।

খ. সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : আজি + কার = আজিকার > আজকের (খবর)। পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)।

সম্বোধন পদ

সম্বোধন অর্থ 'আহ্বান'। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন :

ওহে ইকবাল, এদিকে এসো।

মাধবী, এখানে এসো।

এখানে 'ইকবাল' ও 'মাধবী' সম্বোধন পদ। কারণ তাদেরকে আহ্বান বা সম্বোধন করে কিছু বলা হয়েছে। সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ কিন্তু এই সম্বোধন পদের সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়াপদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

বিভিন্ন কারকে একই বিভক্তির প্রয়োগ

সকল কারকে 'শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ

কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি : **সুজন** স্কুলে যায়।

কর্মকারকে 'শূন্য ' বিভক্তি	:	ঘোড়া **গাড়ি** টানে।
করণ কারকে 'শূন্য' বিভক্তি	:	ছেলেরা **বল** খেলে।
সম্প্রদান কারকে 'শূন্য' বিভক্তি	:	ভিক্ষা দাও দেখিলে **ভিক্ষুক**।
অপাদান কারকে 'শূন্য' বিভক্তি	:	ট্রেনটি **ঢাকা** ছাড়ল।
অধিকরণ কারকে 'শূন্য' বিভক্তি	:	আমরা **খুলনা** যাব।

সকল কারকে 'এ' বা 'সপ্তমী' বিভক্তির প্রয়োগ

কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি	:	**পাগলে** কী না বলে।
কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি	:	জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।
করণ কারকে 'এ' বিভক্তি	:	**জ্ঞানে** বিমল আনন্দ লাভ হয়।
সম্প্রদান কারকে 'এ' বিভক্তি	:	**দীনে** দয়া কর।
অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তি	:	**তিলে** তৈল হয়।
অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি	:	**বনে** বাঘ থাকে।

মোটা অক্ষরের পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয়

অর্থ **অনর্থ** ঘটায়।	কর্মে শূন্য।
অন্ধজনে দেহ আলো।	সম্প্রদানে সপ্তমী
অন্নহীনে অন্ন দাও।	সম্প্রদানে সপ্তমী
আকাশ মেঘে ঢাকা।	অধিকরণে শূন্য
আমার **ভাত** খাওয়া হলো না।	কর্মে শূন্য
আমার খাওয়া হলো না।	কর্তৃকারকে ষষ্ঠী
আকাশে চাঁদ উঠেছে।	অধিকরণে সপ্তমী
ইট-পাথরের বাড়ি বেশ শক্ত।	করণে ষষ্ঠী
ইটের বাড়ি সহজে ভাঙে না।	করণে ষষ্ঠী
এ **কলমে** ভালো লেখা হয়।	করণে সপ্তমী
এ **জমিতে** সোনা ফলে।	অধিকরণে সপ্তমী
এ **কলমে** বেশ লেখা যায়।	করণে সপ্তমী

কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	অধিকরণে সপ্তমী
কাচের জিনিস সহজে ভাঙে।	করণে ষষ্ঠী
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।	অধিকরণে সপ্তমী
কৃষক **লাঙ্গল** চষছে।	করণে শূন্য
কালির দাগ সহজে ওঠে না।	সম্বন্ধে ষষ্ঠী
কাজে মন দাও।	কর্মে সপ্তমী
গাড়ি **স্টেশন** ছাড়ল।	অপাদানে শূন্য
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।	অধিকরণে সপ্তমী
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।	কর্তৃকারকে সপ্তমী
গরুতে গাড়ি টানে।	কর্তৃকারকে সপ্তমী
গুরুজনে কর ভক্তি/নতি।	কর্মে সপ্তমী
গৃহহীনে গৃহ দাও।	সম্প্রদানে সপ্তমী
গগনে গরজে **মেঘ**।	কর্তৃকারকে শূন্য
ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	কর্তৃকারকে সপ্তমী
ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।	অধিকরণে সপ্তমী
চোরের ভয়ে ঘুম আসে না।	অপাদানে ষষ্ঠী
ছাদ থেকে নদী দেখা যায়।	অধিকরণে পঞ্চমী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে।	অধিকরণে সপ্তমী
ছেলেটি **অঙ্কে** কাঁচা।	অধিকরণে সপ্তমী
ছাগলে কী না খায়।	কর্তৃকারকে সপ্তমী
জলকে চল।	নিমিত্তার্থে চতুর্থী
জল পড়ে পাতা নড়ে।	কর্তৃকারকে শূন্য
জমিতে সোনা ফলে।	অধিকরণে সপ্তমী
জলের লিখন থাকে না।	করণে ষষ্ঠী
জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।	কর্মে সপ্তমী

জীবে দয়া করে সাধুজন।	সম্প্রদানে সপ্তমী
জ্ঞানে বিমল আনন্দ হয়।	করণে সপ্তমী
জেলে মাছ ধরে।	কর্তৃকারকে শূন্য
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।	অধিকরণে সপ্তমী
ঝিনুকে মুক্তা আছে।	অধিকরণে সপ্তমী
টাকায় কী না হয়।	করণে সপ্তমী
ট্রেনটি **ঢাকা** ছেড়েছে।	অপাদানে শূন্য
টাকার লোভ ভালো নয়।	সম্বন্ধে ষষ্ঠী
ডাক্তার ডাক।	কর্মে শূন্য
তিনি **ব্যাকরণে** পণ্ডিত।	অধিকরণে সপ্তমী
তিলে তৈল হয়।	অপাদানে সপ্তমী
তিনি **হজ্জে** গেছেন।	নিমিত্তার্থে সপ্তমী
তিনি **বাড়ি** নেই।	অধিকরণে শূন্য
তারা **ফুটবল** খেলে।	করণে শূন্য
তার **ধর্মে** মতি আছে।	অধিকরণে সপ্তমী
দশে মিলে করি কাজ।	কর্তৃকারকে সপ্তমী
দুধে ছানা হয়।	অপাদানে সপ্তমী
দরিদ্রকে ধন দাও।	সম্প্রদানে চতুর্থী
ধোপাকে কাপড় দাও।	কর্মে দ্বিতীয়া
ধান থেকে চাউল হয়।	অপাদানে পঞ্চমী
ধনী **দরিদ্রকে** ঘৃণা করে।	কর্মে দ্বিতীয়া
দেশের জন্য প্রাণ দাও।	সম্প্রদানে ষষ্ঠী
দিব **তোমা** শ্রদ্ধা ভক্তি।	সম্প্রদানে শূন্য
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন।	করণে সপ্তমী
নিজের **চেষ্টায়** বড় হও।	করণে সপ্তমী

নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়।	কর্তৃকারকে তৃতীয়া
নদীতে মাছ আছে।	অধিকরণে সপ্তমী
শিক্ষককে শ্রদ্ধা করিও।	সম্প্রদানে চতুর্থী
শিকারি বিড়াল **গোঁফে** চেনা যায়।	করণে সপ্তমী
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়।	কর্তৃকারকে শূন্য
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়।	কর্মে সপ্তমী
সরোবরে পদ্ম জন্মে।	অধিকরণে সপ্তমী
সব **ঝিনুকে** মুক্তা মিলে না।	অধিকরণে সপ্তমী
সূর্য উঠলে **অন্ধকার** দূর হয়।	কর্মে শূন্য
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেব কোথা।	অধিকরণে সপ্তমী
সাপুড়ে সাপ খেলায়।	কর্তৃকারকে শূন্য
সমুদ্রজলে লবণ আছে।	অধিকরণে সপ্তমী
সর্বভূতে দান কর।	সম্প্রদানে সপ্তমী
সে **বাড়ি** নেই।	অধিকরণে শূন্য
হাতে কাজ কর।	করণে সপ্তমী
হৃদয় আমার নাচে রে **আজিকে**।	অধিকরণে দ্বিতীয়া

শব্দরূপ

একটি শব্দকে বিভিন্ন কারকে সম্বন্ধ পদ হিসেবে এবং সম্বোধনে ব্যবহার করতে হলে বিভক্তি ও অনুসর্গ যোগ করে সংশ্লিষ্ট শব্দের যে রূপ হয়, তাকে বলা হয় **শব্দরূপ**। যেমন :

বালক + কে = বালককে, বালক + এর = বালকের।

নিচে বিশেষ্য শব্দ 'মানুষ' এবং সর্বনাম শব্দ 'আমি', 'তুমি' ও 'সে'– এর একবচনের ও বহুবচনের শব্দরূপ দেখানো হলো :

(ক) বিশেষ্য শব্দের রূপ : মানুষ

মানুষ

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	মানুষ, মানুষে (মানুষ+এ)	মানুষেরা (মানুষ + এরা) মানুষগুলি-গুলো, মানুষগণ, মানুষসকল মানুষদের।
কর্ম	মানুষকে (মানুষ+কে)	মানুষদিগকে, মানুষদেরকে (দিগ+কে) (দের+কে)
করণ	মানুষ দ্বারা, মানুষ দিয়া > দিয়ে মানুষকে দিয়ে	মানুষগুলো দ্বারা, মানুষগুলোকে দিয়ে
সম্প্রদান	মানুষকে (মানুষ + কে)	
অপাদান	মানুষ হইতে, মানুষ হতে, মানুষ থেকে, মানুষের কাছ থেকে	মানুষদিগ হইতে, মানুষদের কাছ থেকে; মানুষগুলোর কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	মানুষের	মানুষদিগের, মানুষদের, মানুষগুলোর
অধিকরণ	মানুষের	মানুষদিগের, মানুষগণের মানুষগুলোর, মানুষদের
সম্বোধন	হে মানুষ!	হে মানুষগণ, মানুষসব

(খ) সর্বনাম শব্দের রূপ : আমি, তুমি, সে

আমি

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	আমি	আমরা, আমরা-সব, আমরা-সকলে
কর্ম ও সম্প্রদান	আমাকে	আমাদিগকে > আমাদের, আমাদেরকে
করণ	আমা দ্বারা, আমার দ্বারা, আমাকে দিয়া > দিয়ে	আমাদিগের দ্বারা, আমাদের দ্বারা, আমাদেরকে দিয়ে

২০২৫

অপাদান	আমা হইতে > হতে আমার কাছ থেকে	আমাদিগ হইতে, আমাদিগের নিকট হইতে, আমাদের কাছ থেকে
সম্বন্ধ	আমার, মোর (পদ্যে)	আমাদিগের > আমাদের, মোদের (পদ্যে) আমা সবাকার (পদ্যে)
অধিকরণ	আমাতে, আমার মধ্যে	আমাদিগেতে, আমাদিগের মধ্যে > আমাদের মধ্যে

তুমি

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	তুমি	তোমরা, তোমরা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তোমাকে	তোমাদিগকে, তোমাদেকে, তোমাদেরকে
করণ	তোমার দ্বারা, তোমাকে দিয়া > দিয়ে	তোমাদিগের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা, তোমাদিগকে দিয়া, তোমাদের দিয়ে
আপাদান	তোমা হইতে > হতে, তোমার নিকট হইতে, তোমার কাছ থেকে	তোমাদিগ হইতে, তোমাদিগের নিকট হইতে, তোমাদের কাছ থেকে, তোমাদিগের > তোমাদের তোমা সবাকার
সম্বন্ধ	তোমার তব (পদ্যে)	তোমাদিগের > তোমাদের, তোমা সবাকার (পদ্যে)
অধিকরণ	তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে	তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে

সে

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	সে	তাহারা > তারা, তারা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তাহাকে > তাকে	তাহাদিগকে > তাদেকে, তাদেরকে
করণ	তাহা দ্বারা, তাহার দ্বারা, তাহাকে দিয়ে, তাকে দিয়ে	তাহাদিগ দ্বারা, তাহাদের দ্বারা, তাদের দিয়ে
অপাদান	তাহা হইতে, তাহার নিকট হইতে, তার কাছ থেকে	তাহাদিগ হইতে, তাহাদিগের নিকট হইতে
সম্বন্ধ	তাহার, তার, তস্য	তাদের কাছ থেকে, তাহাদিগের, তাহাদের > তাদের
অধিকরণ	তাহাতে, তাহার মধ্যে > তাতে, তার মধ্যে	তাহাদিগেতে, তাহাদিগের মধ্যে

বিশেষণের 'তর' ও 'তম'

'–তর' আপেক্ষিক উৎকর্ষবাচক বা অপকর্ষবাচক প্রত্যয় এবং '–তম' বহু বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে একজনের সর্বাধিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষবোধক প্রত্যয়।

দুটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করতে সংস্কৃতের নিয়মানুসারে বিশেষণের সঙ্গে '–তর' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং দুয়ের বেশি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বোঝাতে বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয় '–তম' প্রত্যয়। মোটকথা, সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী দুয়ের মধ্যে তুলনা করতে হলে বিশেষণের সঙ্গে '–তর' এবং বহুর সঙ্গে তুলনা করতে হলে '–তম' যোগ হয়।

'তর' এবং 'তম' এ দুটি প্রত্যয়কে একত্র করে হয়েছে—'তরতম', যার অর্থ 'কম-বেশি'।
লক্ষণীয় 'তারতম্য' শব্দটিও 'তরতম' থেকে তৈরি। যেমন : তরতম + য = তারতম্য।

'তর' এবং 'তম' -এর প্রয়োগ

মূল বিশেষণ শব্দ	তর-যোগে	তম-যোগ
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
মহৎ	মহত্তর	মহত্তম
দীর্ঘ	দীর্ঘতর	দীর্ঘতম
প্রশস্ত	প্রশস্ততর	প্রশস্ততম

'–তর' '–তম'–এর বাক্যে প্রয়োগ

১. চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা **ক্ষুদ্রতর**।
২. হিমালয় পৃথিবীর **উচ্চতম** পর্বত।
৩. কক্সবাজার বিশ্বের **দীর্ঘতম** সমুদ্রসৈকত।
৪. মালদ্বীপ বাংলাদেশের চেয়ে **ক্ষুদ্রতর**।
৫. মেঘনা বাংলাদেশের **দীর্ঘতম** নদী।

বিশেষণের তারতম্য

কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে অপর ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ গুণ, অবস্থা ইত্যাদি তুলনা করা যায়। এভাবে তুলনায় ভালো-মন্দ, কম-বেশি বা উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়ে থাকে। এ ধরনের তুলনা করাকে বিশেষণের তারতম্য বলে। বিশেষণের তারতম্য প্রকাশের জন্য বাংলা ও সংস্কৃত দুটি রীতি আছে।

বাংলা রীতি

(ক) দুইয়ের মধ্যে তুলনায়, যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তার পরে 'অপেক্ষা', 'চেয়ে' প্রভৃতি অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন: চাটগাঁর **চেয়ে** ঢাকা বড় শহর। রুপা **অপেক্ষা** সোনা দামি ইত্যাদি।

(খ) বহুর মধ্যে তুলনায় একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জানতে হলে 'সর্বাপেক্ষা', 'সবচেয়ে', 'সকলের চেয়ে' ইত্যাদি পদ বা বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। যেমন : এ ছাত্রটি **সবচেয়ে** ভালো। সে **সকলের চেয়ে** ভালো লেখে ইত্যাদি।

সংস্কৃত রীতি

(ক) দুইয়ের মাঝে তুলনায় বিশেষণ শব্দের শেষে 'তর' প্রত্যয় এবং দুইয়ের বেশির মাঝে তুলনায় 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : বাঘ অপেক্ষা হাতি বৃহত্তর। গাঁয়ে তিনিই বিজ্ঞতম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

মূল বিশেষণের শব্দ	তর-যোগে	তম-যোগে
দীর্ঘ	দীর্ঘতর	দীর্ঘতম
মহৎ	মহত্তর	মহত্তম
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
প্রশস্ত	প্রশস্ততর	প্রশস্ততম

(খ) 'তারতম্য' বোঝাতে সংস্কৃত ঈয়স্ (দুইয়ের মধ্যে) ও ইষ্ঠ (বহুর মধ্যে) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন :

মূল বিশেষণ শব্দ	ঈয়স্-যোগে	ইষ্ঠ-যোগে
গুরু	গরীয়স্ > গরীয়ান	গরিষ্ঠ
বৃদ্ধ	বর্ষীয়স্ > বর্ষীয়ান	জ্যেষ্ঠ
বলবৎ	বলীয়স্ > বলীয়ান	বলিষ্ঠ

বিশেষণের তারতম্য বোঝানোর জন্য সংস্কৃত রীতি খাঁটি বাংলাতেও প্রচলিত। তবে বাংলা ভাষার কিছু নিজস্ব রীতিও আছে। দুয়ের মধ্যে তুলনায় চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন:
জেমসের **চেয়ে** যোসেফ বেশি বলবান। রাম **অপেক্ষা** শ্যাম বুদ্ধিমান।

বহুর সঙ্গে তুলনায় 'সর্বাপেক্ষা', 'সবচেয়ে', 'সবচাইতে', 'সকলের মধ্যে', 'সবার চাইতে' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যেমন: পশুর মধ্যে হস্তী **সর্বাপেক্ষা** বৃহৎ। গাছের মধ্যে বটগাছ **সবচেয়ে** বিশাল। **সবচাইতে** ভালো খেজুর রস আর শীতের পিঠা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। নিচের কোন বাক্যে দ্বিতীয় বিভক্তির ব্যবহার হয়েছে?
ক. শিমুকে যেতে হবে
খ. সজল গান গায়
গ. দেশের সেবা কর
ঘ. রাজায় রাজায় যুদ্ধ

২। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। কোন কারকের উদাহরণ?
ক. কর্তৃ কারক খ. কর্ম কারক
গ. করণ কারক ঘ. সম্প্রদান কারক

৩। বনে বাঘ থাকে। নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকের ৭মী বিভক্তির উদাহরণ?
ক. কর্তৃ
খ. অধিকরণ
গ. অপাদান
ঘ. কর্ম

৬. শব্দ গঠন

শব্দ

এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে বলা হয় শব্দ। অর্থাৎ ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলন ঘটলে তাকে শব্দ বলে। যেমন : ক্+অ+ল্+অ+ম্ ধ্বনি। এ ধ্বনি পাঁচটির মিলিত রূপ হলো 'কলম'। 'কলম' এমন একটি বস্তুকে বোঝাচ্ছে, যা দিয়ে লেখা যায়। 'কলম'– 'ক', 'ল', 'ম' ধ্বনিসমষ্টির মিলিত রূপ, যা অর্থপূর্ণ। সুতরাং 'কলম' একটি শব্দ।

শব্দের গঠন

গঠনগত দিক থেকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত : ক. **মৌলিক শব্দ** ও খ. **সাধিত শব্দ**।

ক. মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে **মৌলিক শব্দ** বলে। যেমন :

আম, বই, কলম ইত্যাদি।

মৌলিক শব্দ গঠনের প্রথম উপায় বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যোগ। যেমন :

আ + ম = আম

ব + ই = বই

ক + ল + ম = কলম ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'ফলা' বলা হয়। সরল বর্ণের সঙ্গে 'কার' বা 'ফলা' যোগ করে শব্দ গঠন করা যায়। নিচে 'কার' ও 'ফলা' যোগে শব্দ গঠনের উদাহরণ প্রদত্ত হলো :

'কার' যোগ করে

ক্ + অ = ক, ল্ + আ = লা দুটোর মিলনে ক + লা = কলা।

উপর্যুক্ত উদাহরণে ক্-এর সঙ্গে 'অ' যুক্ত হয়ে প্রথমে 'ক' হয়েছে এবং ল্-এর সঙ্গে 'আ' যুক্ত হয়ে 'লা' হয়েছে। 'ক' ও 'লা' মিলিত হয়ে 'কলা' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, অ-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। অ-ব্যঞ্জনের সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে যায়। যেমন : ক্ + অ = ক, খ্ + অ = খ।

'ফলা' যোগ করে

য-ফলা (্য)	:	ক্ + য	= ক্য।	উদাহরণ : বাক্য, ঐক্য, আধিক্য।
র-ফলা (্র)	:	ক্ + র	= ক্র।	উদাহরণ : চক্র, বক্র।
ম-ফলা (্ম)	:	ত্ + ম	= ত্ম।	উদাহরণ : আত্ম।
		দ্ + ম	= দ্ম।	উদাহরণ : পদ্ম।
		হ্ + ম	= হ্ম।	উদাহরণ : ব্রাহ্মণ।
ব-ফলা (্ব)	:	স্ + ব	= স্ব।	উদাহরণ : নিঃস্ব।
		শ্ + ব	= শ্ব।	উদাহরণ : অশ্ব, বিশ্ব।

র-এর আরেকটি সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে রেফ [র্]। রেফ বর্ণের শীর্ষে যুক্ত হয়। যেমন : র্ক। উদাহরণ : অর্ক, তর্ক, সতর্ক।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে **সাধিত শব্দ** বলে।

সাধারণত কোনো মৌলিক বা ভিত্তি শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদান যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্যের জন্য নানাভাবে শব্দের রূপ-রূপান্তর সাধন করা হয়। বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারোপযোগী করে কোনো শব্দ বা শব্দাংশের সঙ্গে অন্য শব্দ বা শব্দাংশের মিলনে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

শব্দগঠন : শব্দগঠন বলতে সাধারণভাবে আমরা শব্দ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বুঝে থাকি। নতুন শব্দ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে শব্দগঠন বলে। যে কোনো ভাষায় শব্দগঠন প্রক্রিয়া দুইটি।

১। প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দগঠন ও
২। সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন

উপসর্গ শব্দগঠনের প্রক্রিয়া নয়, উপাদান মাত্র। কারণ উপসর্গযুক্ত সকল শব্দই সমাস-সাধিত শব্দ; হয় অব্যয়ীভাব সমাস, না হয় প্রাদি সমাস। কাজেই উপসর্গযোগে শব্দগঠন প্রকারান্তরে শব্দগঠনের প্রক্রিয়া আলোচনা করা অবান্তর।

সন্ধি শব্দগঠনের প্রক্রিয়া নয়। কেননা সন্ধিবদ্ধ শব্দ মাত্রই হয় প্রত্যয়-সাধিত শব্দ, নয় সমাস-সাধিত শব্দ। প্রত্যয় ও সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠনকালে সন্ধি হলো পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনি-সংযোগের নিয়ম। এ প্রসঙ্গে প্রত্যয়-সন্ধির সূত্রাবলি স্মরণযোগ্য।

পদ পরিবর্তন প্রত্যয়ের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই পদ পরিবর্তন শব্দগঠনের কোনো প্রক্রিয়া নয়। প্রকৃতি–প্রত্যয়ই শব্দগঠনের প্রক্রিয়া।

বিভক্তির সাহায্যে শব্দগঠিত হয় না। বিভক্তিযোগে শব্দ ও ধাতু পদবাচ্য হয়। তাই বিভক্তিযোগে শব্দগঠন আলোচনা করা নিরর্থক।

এখন শব্দগঠন প্রক্রিয়া দুইটি আলোচনা করা হলো :

১. প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : শব্দ বা ধাতুর পরে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন :

মিঠা + আই	= মিঠাই	কুসুম + ইত	= কুসুমিত
√চল্ + অন্ত	= চলন্ত	√কৃ + তব্য	= কর্তব্য
বিমান + ইক	= বৈমানিক	মনু + অ	= মানব

২. সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন :

মাতা ও পিতা	= মাতা-পিতা	সিংহ চিহ্নিত আসন	= সিংহাসন
দিন দিন	= প্রতিদিন	বিষাদ রূপ সিন্ধু	= বিষাদসিন্ধু

বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের নিয়ম জানা থাকলে কোন শব্দ ব্যাকরণগত কোন শ্রেণিতে পড়ে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় এবং বহুল প্রচলিত শব্দের বদলে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। সর্বোপরি ভাষাকে শুদ্ধভাবে বলতে, পড়তে, লিখতে এবং ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে শব্দের গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

উপসর্গযোগে শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ আছে, যেগুলো কখনোই স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। বস্তুত, যেসব অব্যয়-শব্দ ধাতু বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সব অব্যয় শব্দই উপসর্গ নামে পরিচিত।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় : যেমন 'ভাত' একটি শব্দ। এর পূর্বে 'প্র' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'প্রভাত,' যার অর্থ 'প্রত্যূষ' বা 'প্রাতঃকাল'। 'নাম' শব্দের পূর্বে 'প্র' যোগ করলে হয় 'প্রণাম,' যার অর্থ 'অভিবাদন' বা 'নমস্কার'। 'গতি' শব্দের পূর্বে 'প্র' যোগ করলে হয় 'প্রগতি,' যার অর্থ 'সামাজিক অগ্রগতি' বা 'সমৃদ্ধি'। এখানে একই উপসর্গ একাধিক অর্থদ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। আবার উপসর্গভেদে শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। যেমন : 'নাম' শব্দের পূর্বে 'সু' উপসর্গ যুক্ত হলে হয় 'সুনাম'। 'বদ' উপসর্গ যুক্ত

হলে হয় 'বদনাম'। লক্ষণীয় যে 'সুনাম' ও 'বদনাম' —এ শব্দ দুটোর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এভাবে বিভিন্ন শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন অব্যয়সূচক শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।

সংজ্ঞা : যেসব অব্যয়সূচক শব্দাংশ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনপূর্বক অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা পরিবর্তন সাধন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ হয় তাকে বলে উপসর্গ। — ডক্টর রামেশ্বর শ'

নিচে 'নাম' মূল শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গযোগে শব্দ গঠনের একটি লেখচিত্র প্রদত্ত হলো :

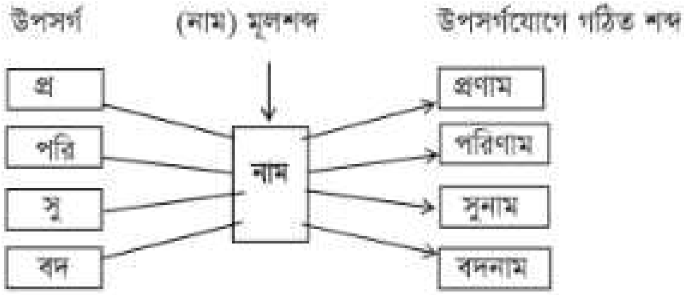

উপসর্গের কার্যাবলি : উপসর্গ একধরনের উপসৃষ্টি। উপসর্গযোগে শব্দের যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে, তা প্রধানত নিম্নরূপ :

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়

২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়

৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে

৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে এবং

৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়।

উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা

উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু এরা অর্থের দ্যোতক। উপসর্গ অন্য শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি বা শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন :

হা + ভাত = হাভাত (নতুন শব্দ)

পরি + পূর্ণ = পরিপূর্ণ (অর্থের সম্প্রসারণ)

অ + ভাব = অভাব (অর্থের সংকোচন)

উপ + কথা = উপকথা (অর্থের পরিবর্তন)

কিন্তু 'হা', 'পরি', 'অ', 'উপ' –এগুলোর আলাদা কোনো অর্থ নেই। **শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত না হলে উপসর্গ**

কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। অর্থাৎ উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করতে অক্ষম। কিন্তু যখনই এরা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে, তখনই এদের অর্থদ্যোতকতা শক্তি সৃষ্টি হয়। যেমন : 'হার' শব্দটির পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গযোগে অনেকগুলো অর্থদ্যোতক শব্দ গঠিত হতে পারে :

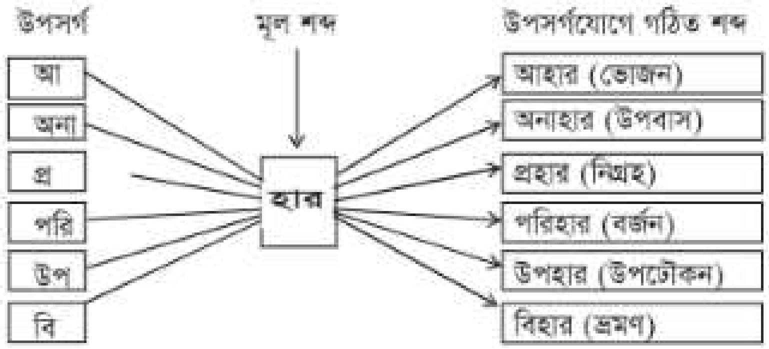

উপরের লেখচিত্রে আ, অনা, প্র, পরি, উপ, বি উপসর্গগুলোর স্বাধীন কোনো অর্থ নেই। কিন্তু এ উপসর্গগুলো 'হার' শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে অর্থবোধক একাধিক শব্দ তৈরি করেছে। সুতরাং বলা যায় **উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।**

উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় উপসর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উপসর্গ শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এবং অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন ঘটায়। উপসর্গ নতুন শব্দ সৃষ্টি করে ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বস্তুত শব্দ গঠন ও অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই উপসর্গের কাজ। উপসর্গ অর্থহীন হলেও এদের সার্থক প্রয়োগে ভাষার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

উপসর্গযোগে শব্দ গঠন :

উপসর্গ	উদাহরণ
অ	অকাজ, অচিন, অজানা, অখুশি, অচেনা, অমিল, অকাল, অবেলা, অনড়।
অঘা	অঘাচণ্ডী, অঘারাম।
অজ	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর।
অনা	অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়, অনাসৃষ্টি, অনাচার, অনামুখো, অনাদর, অনাদায়।
আ	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, আমাপা, আঘাটা, আকাট, আকাল, আকাঠা।
আড়	আড়চোখে, আড়নয়নে, আড়পাগলা, আড়ক্ষ্যাপা, আড়কোলা, আড়গড়া।

আন	আনকোরা, আনচান, আনমনা।
আব	আবছায়া, আবডাল।
ইতি	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে, ইতিকথা, ইতিহাস।
উন (ঊনা)	ঊনপাঁজুরে, উনিশ, ঊনবর্ষা।
কদ্	কদবেল, কদর্য, কদাকার।
কু	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুসঙ্গ, কুনজর, কুকাম, কুযশ।
নি	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিখরচা, নির্ভাজ, নিরেট, নিলাজ, নিটোল, নিরেট।
পাতি	পাতিকাক, পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতকুয়া।
বি	বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিদেশ, বিজোড়।
ভর	ভরপুর, ভরপেট, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যা, ভরদিন, ভরসাঁঝ।
রাম	রামছাগল, রামদা।
স	সঠিক, সরব, সলাজ, সটান, সজোর, সখেদ, সজ্ঞান।
সা	সাজোয়ান, সাজিরা।
সু	সুখবর, সুদিন, সুনজর, সুনাম, সুডৌল।
হা	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ।
প্র	প্রকাশ, প্রভাত, প্রচলন, প্রগতি, প্রহার, প্রতাপ, প্রভাব, প্রচেষ্টা, প্রবেশ, প্রচার, প্রশাখা, প্রদান।
পরা	পরামর্শ, পরাধীন, পরাক্রম, পরাকাষ্ঠা, পরায়ণ, পরাজয়, পরাভব।
অপ	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ, অপকর্ম, অপব্যয়, অপযশ, অপব্যাখ্যা, অপসারণ, অপমৃত্যু।
সম্	সমাদর, সমাগত, সম্মুখ, সম্পূর্ণ, সংবাদ, সংযম, সম্মান, সমধিক।
নি	নিখর, নিবাস, নিগম, নিচয়, নিবৃত্তি, নিবারণ, নিদাঘ, নিগূঢ়, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।
অনু	অনুতাপ, অনুগ্রহ, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকরণ, অনুসরণ, অনুক্ষণ।
অব	অবকাশ, অবসর, অবজ্ঞা, অবমাননা, অবগত, অবগাহন, অবরোধ, অবতরণ, অবরোহণ।
নির্	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহংকার, নির্ধারণ, নির্দেশ, নির্ণয়, নির্ভয়, নির্গত, নির্বাসন, নিরীক্ষণ, নিরঙ্কুশ।

১০৫৬

দুস্ দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্জয়, দুর্ঘটনা, দুর্দিন, দুর্নীতি, দুর্বল, দুর্যোগ।

বি বিজয়, বিপক্ষ, বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ, বিশুষ্ক, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল, বিচরণ, বিক্ষেপ, বিকার, বিপর্যয়।

অধি অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী, অধিকর্তা, অধিবেশন, অধিবর্ষ, অধিনায়ক, অধিকর্তা, অধিষ্ঠান।

সু সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুনীল, সুগম, সুলভ, সুকঠিন, সুধীর, সুচতুর, সুরম্য, সুনিপুণ, সুদূর, সুচরিত্র।

উৎ উৎসব, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপাদন, উচ্চারণ, উদ্দেশ্য।

পরি পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিমাণ, পরিশেষ, পরিসীমা, পরিশ্রম, পরিতাপ, পরিচালক, পরিদর্শন।

প্রতি প্রতিদান, প্রতিকার, প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ, প্রতিবেশী, প্রতীক্ষা, প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিদিন।

অভি অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত, অভিধান, অভিনয়, অভিযান, অভিসার, অভিমুখ, অভিবাদন।

অতি অতিকায়, অত্যাচার (অতি + আচার), অতিশয়, অতিক্রম, অতিরিক্ত, অত্যন্ত (অতি + অন্ত)।

অপি অপিনিহিত, অপিনিহিতি, অপিধান।

উপ উপকার, উপকূল, উপকণ্ঠ, উপদ্বীপ, উপবন, উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপনয়ন (পৈতা)।

আ আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র, আরক্ত, আভাস, আদান, আগমন, আগ্রহ, আহার, আরক্ত।

বাক্যে উপসর্গযুক্ত শব্দের প্রয়োগ

অ : লোকটি আমার **অচেনা**।

অঘা : **অঘারাম** বলেই সে এমন কাণ্ড করে বসেছে।

অজ : **অজপাড়াগাঁয়ে** শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে।

অনা : **অনাবৃষ্টিতে** এ বছর ফসলের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।

আ : **আধোয়া** প্লেটে খাবার খেতে নেই।

আড় : মিতা রিতার দিকে **আড়চোখে** তাকিয়ে আছে।

আন : সন্তানের জন্য মায়ের মন সব সময়ই **আনচান** করে।

আব : আড়ালে **আবডালে** কারো সমালোচনা করতে নেই।

ইতি : **ইতিহাস** থেকে সকলেরই শিক্ষা নেওয়া উচিত।

উন/উনা : '**উনাভাতে** দুনা বল।'

কদ্ : **কদবেলে** প্রচুর ভিটামিন আছে।

কু : **কুসঙ্গ কুফল** বয়ে আনে।

নি : মেয়েটির সূচিকর্ম খুবই **নিখুঁত**।

পাতি : ঝিলের জলে **পাতিহাঁস** ভেসে বেড়াচ্ছে।

বি : সাধনা কখনো **বিফলে** যায় না।

ভর : এখন **ভরদুপুর,** একটু পরে বের হও।

রাম : **রামছাগলের** বাচ্চাটা তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে।

স : **সঠিক** উত্তরে টিক চিহ্ন দাও।

সা : লড়াইয়ে জিততে হলে **সাজোয়ান** লোকই প্রয়োজন।

সু : সৎকর্ম **সুনাম** বয়ে আনে।

হা : **হাভাতে** ছেলেটার জন্য মায়ের কত **হাপিত্যেশ**।

২. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই সঙ্গে তৎসম উপসর্গও সংস্কৃত শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ তৈরি করে অর্থের সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। উল্লেখ্য, খাঁটি বাংলা উপসর্গ যেমন খাঁটি

বাক্যে তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত শব্দের প্রয়োগ

প্র : '**প্রভাতে** উঠিল রবি লোহিত বরণ।'

পরা : '**পরাজয়ে** ডরে না বীর।'

অপ : **অপব্যয়** দারিদ্র্য ডেকে আনে।

সম্ : অতিথি **সমাদরে** কার্পণ্য অনুচিত।

নি : এখনই বৃষ্টি নামবে, তাকে যেতে **নিবারণ** কর।

অব : সমাজের কল্যাণে প্রত্যেকেরই **অবদান** রাখা উচিত ।

অনু : **অনুগ্রহ** করে একটু বাইরে আসুন।

নির : গুরুজনের **নির্দেশ** অমান্য করো না।

দুর : **দুর্জন** বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

বি : লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা **বিজয়** ছিনিয়ে এনেছি।

সু : **সুজলা-সুফলা** শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ।

উৎ : চাষিদের ঘরে ঘরে নবান্নের **উৎসব**।

অধি : নিজের **অধিকার** নিজেকেই বুঝে নিতে হবে।

পরি : হিংসার **পরিণাম** কখনোই ভালো হয় না।

প্রতি : অন্যায়ের **প্রতিবাদ** করতে হবে।

উপ : **উপকারীর উপকার** স্বীকার করা উচিত।

অভি : ফরহাদ সাহেব একজন **অভিজ্ঞ** শিক্ষক।

অপি : **অপিনিহিতি** ধ্বনি পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ম।

অতি : বর্ষাকালে **অতিরিক্ত** বৃষ্টিপাত হওয়াই স্বাভাবিক।

আ : **আকণ্ঠ** ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (নমুনা)

১। **'তর' ও 'তম' প্রত্যয় দুটি যুক্ত হয় কোন রীতিতে?**
ক. বাংলা রীতি
খ. সংস্কৃত রীতি
গ. দেশী
ঘ. বিদেশী

২। **উপসর্গের কাজ-**
i. নতুন শব্দ গঠন করা
ii. অর্থের পরিবর্তন করা
iii. অর্থের সম্প্রসারণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii, ও iii

কর্ম-অনুশীলন

১। প্র, কার, প্রতি, অব, আ, অভি, অনু, ফি, অ, অনা, বর, রাম, হা, কম— উপসর্গগুলো নিচের ছকে সঠিক শ্রেণিতে বিন্যস্ত কর।

বাংলা উপসর্গ	তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ	বিদেশি উপসর্গ

প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন

কৃৎ ও তদ্ধিত দুই ধরনের প্রত্যয়ই শব্দ গঠনে সহায়ক। 'যা পরে যুক্ত হয় তা-ই প্রত্যয়।' সুতরাং **যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তা-ই প্রত্যয়।**

ভাষার সমৃদ্ধি শব্দের ওপর নির্ভরশীল। যে ভাষায় যত বেশি শব্দ আছে, সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের একটি অন্যতম রীতি হচ্ছে প্রত্যয়। কিন্তু প্রত্যয়ের নিজের কোনো স্বাধীন অর্থ নেই।

সংজ্ঞা : যে **বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে।**

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, ধাতু বা শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হইয়া শব্দ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে প্রত্যয় বলে।

যেমন :

হাত + আ = হাতা; মনু + অ = মানব; √চল্ + অন্ত = চলন্ত; √কৃ + অক = কারক।

এখানে, 'আ', 'অ', 'অন্ত', এবং 'অক'—এগুলো প্রত্যয়। 'হাত', 'মনু' **নাম-প্রকৃতি** এবং চল্', 'কৃ' **ক্রিয়া-প্রকৃতি।**

প্রত্যয়ের শ্রেণিবিভাগ : প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা : **১. কৃৎ প্রত্যয় ও ২. তদ্ধিত প্রত্যয়।**

কৃৎ প্রত্যয় : ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন :

√ধর্ + আ = ধরা √ডুব্ + উরী = ডুবুরী √দৃশ + য = দৃশ্য ইত্যাদি।

তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন :

বাঘ + আ = বাঘা   সোনা + আলি = সোনালি   সপ্তাহ + ইক = সাপ্তাহিক ইত্যাদি।

প্রত্যয়ের মাধ্যমে শব্দগঠনের ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' ও 'প্রাতিপদিক' এ দুটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রকৃতি : শব্দ বা ধাতুর মূলই হচ্ছে প্রকৃতি। অর্থাৎ **'মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, তাকে বলা হয় প্রকৃতি।'** অথবা, ভাষায় **যার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, এমন মৌলিক শব্দকে প্রকৃতি বলে।** শব্দ কিংবা পদ থেকে প্রত্যয় ও বিভক্তি অপসারণ করলে প্রকৃতি অংশ পাওয়া যায়।

প্রকৃতি দুই প্রকার। যথা: (ক) **ক্রিয়া-প্রকৃতি বা** ধাতু,

(খ) **নাম-প্রকৃতি বা সংজ্ঞা-**প্রকৃতি।

(ক) ক্রিয়া-প্রকৃতি : প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের বিশ্লেষণে মৌলিক ভাব-দ্যোতক যে অংশ পাওয়া যায়, তা যদি অবস্থান, গতি বা অন্য কোনো প্রকারের ক্রিয়া বোঝায়, তাকে **ক্রিয়া-প্রকৃতি** বলে। যেমন : √চল্, √পড়্, √রাখ্, √দৃশ্, √কৃ প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রকৃতি। [চলন্ত = চল (ক্রিয়া-প্রকৃতি) + অন্ত (প্রত্যয়)]

(খ) নাম-প্রকৃতি : প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের বিশ্লেষণে মৌলিক ভাব-দ্যোতক যে অংশ পাওয়া যায়, তা যদি কোনো দ্রব্য, জাতি, গুণ বা কোনো পদার্থকে বোঝায়, তাকে **নাম-প্রকৃতি** বলে। যেমন : মা, চাঁদ, গাছ, প্রভৃতি নাম-প্রকৃতি।

হাতল = হাত (নাম-প্রকৃতি) + অল (প্রত্যয়) ‌।

প্রাতিপদিক : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন : হাত, বই, কলম, মাছ ইত্যাদি।

প্রত্যয় সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১. **ক্রিয়াবাচক শব্দমূলের ক্ষেত্রে ধাতু চিহ্ন (√) ব্যবহৃত হয়।** যেমন : √চল্ + অন্ত = চলন্ত; √পঠ্ + অক = পাঠক।

২. **'ধাতু' ও 'প্রত্যয়' উভয়কে একসঙ্গে উচ্চারণ করার সময় ধাতুর অন্ত্যধ্বনি এবং প্রত্যয়ের আদিধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রভাবে সমতা প্রাপ্তহয়।** যেমন : √কাঁদ্ + না = কান্না; √রাঁধ্ + না = রান্না। উল্লিখিত উদাহরণে ধাতুর অন্ত্যধ্বনি 'দ্' ও 'ধ্' প্রত্যয়ের আদিধ্বনি 'ন'-এর সমতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

২০২৫

কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংখ্যা অনেক। নিচে প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক প্রত্যয়ের মাধ্যমে শব্দ গঠনের উদাহরণ প্রদত্ত হলো :

১. **অ (অচ্)**
√পঠ্ + অ = পাঠ। √জি + অ = জয়।

২. **অনীয় (অনীয়র্)**
√কৃ + অনীয় = করণীয়। √পা + অনীয় = পানীয়।
√স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়। √দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়।

৩. **তি (ক্তি)**
√কৃ + তি = কৃতি। √কৃত্ + তি = কীর্তি। √কৃষ্ + তি = কৃষ্টি। √দৃশ্ + তি = দৃষ্টি।

৪. **অ** √কাঁদ্ + অ = কাঁদ। √ধর্ + অ = ধর। √চল্ + অ = চল। √পড়্ + অ = পড়।

৫. **অন > ওন** √নাচ্ + অন = নাচন। √কাঁদ্ + অন = কাঁদন।

৬. **আইত** √ডাক্ + আইত = ডাকাইত > ডাকাত। √সেব্ + আইত = সেবাইত > সেবায়েত।

৭. **আনি** √জ্বাল্ + আনি = জ্বালানি। √ঝাঁক্ + আনি = ঝাঁকানি। √নিড়্ + আনি = নিড়ানি।

৮. **উক, উকা** √মিশ্ + উক = মিশুক। √খা + উকা = খাউকা > খেকো।

৯. **তি** √উঠ্ + তি = উঠতি। √ঘাট্ + তি = ঘাটতি। √কাট্ + তি = কাটতি।

১০. **অ (ষ্ণ, অণ্)** মনু + অ = মানব। দনু + অ = দানব। মধু + অ = মাধব।

১১. **আয়ন (ষ্ণায়ন্, ষ্ণক্)** নর + আয়ন = নারায়ণ। দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন। রাম + আয়ন = রামায়ণ।

১২. **ইক (ষ্ণিক, ঠক্)** অক্ষর + ইক = আক্ষরিক। ইতিহাস + ইক = ঐতিহাসিক। বর্ষ + ইক = বার্ষিক।

১৩. ঈ (ইন, ইনী) ধন + ঈ = ধনী। সুখ + ঈ = সুখী। হস্ত + ঈ = হস্তী।

১৪. ঈয় (ছীয়, ছ)

জল + ঈয় = জলীয়। আত্মন্ + ঈয় = আত্মীয়। মানব + ঈয় = মানবীয়। রাষ্ট্র + ঈয় = রাষ্ট্রীয়।

১৫. ত্ব মাতৃ + ত্ব = মাতৃত্ব। মনুষ্য + ত্ব = মনুষ্যত্ব। ভ্রাতৃ + ত্ব = ভ্রাতৃত্ব।

১৬. বান (বতুপ্) ধন + বান = ধনবান। জ্ঞান + বান = জ্ঞানবান। রূপ + বান = রূপবান।

১৭. মান্ (মৎ, মতুপ্)

বুদ্ধি + মান্ = বুদ্ধিমান। ধী + মান্ = ধীমান। শক্তি + মান্ = শক্তিমান।

১৮. অক ঢোল + অক = ঢোলক। নোল + অক = নোলক। গোল + অক = গোলক।

১৯. অল হাত + অল = হাতল। দীঘ + অল = দীঘল। শীত + অল = শীতল।

২০. আ কাঁচ + আ = কাঁচা। চোর + আ = চোরা। গাছ + আ = গাছা।

২১. আই নিম + আই = নিমাই। কানু + আই = কানাই। বোন + আই = বোনাই।

২২. আইত > আত্ সেবা + আইত = সেবাইত। সঙ্গ + আইত = সাঙ্গাইত>সাঙ্গাত।

২৩. আচি বেঙ্ + আচি = বেঙাচি। ঘাম + আচি = ঘামাচি। ধুনা + আচি = ধুনাচি।

২৪. আন্ > আনো জুতা + আন্ = জুতান > জুতানো। বেত + আন্ = বেতান > বেতানো।

২৫. আনি তল + আনি = তলানি। নাক + আনি = নাকানি। চোব + আনি = চোবানি।

২৬. আমি পাকা + আমি = পাকামি। ছেলে + আমি = ছেলেমি। ইতর + আমি = ইতরামি।

২৭. আর্ কাম + আর = কামার। কুম + আর = কুমার। চাম + আর = চামার।

২৮. আরী ; আরি কাঁসা + আরী = কাঁসারী; কাঁসারি। কাণ্ড + আরী = কাণ্ডারী ; কাণ্ডারি।

২৯. উয়া > ও গাছ + উয়া = গাছুয়া > গেছো। গাঁ + উয়া = গাঁউয়া > গেঁয়ো।

৩০. **ময়** কাদা + ময় = কাদাময়। ঘর + ময় = ঘরময়। জল + ময় = জলময়।

৩১. **আনা, আনি** বাবু + আনা = বাবুয়ানা। সাহেবি + আনা = সাহেবিয়ানা। নজর + আনা = নজরানা।

৩২. **খানা** মুদি + খানা = মুদিখানা। ছাপা + খানা = ছাপাখানা।

৩৩. **খোর** ঘুষ + খোর = ঘুষখোর। নেশা + খোর = নেশাখোর। হারাম + খোর = হারামখোর।

৩৪. **গর > কর** কারি + গর = কারিগর, কারিকর। জাদু + গর = জাদুগর, জাদুকর।

৩৫. **গিরি** বাবু + গিরি = বাবুগিরি। মুটে + গিরি = মুটেগিরি। কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। প্রাতিপদিকের সঠিক উদাহরণ কোনটি?

ক. হাতল
খ. হাত
গ. হাতা
ঘ. হাতাত

২। নিচের কোনটি বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ ?

ক. বাবু + আনা = বাবু আনা
খ. √পঠ্ + অ = পাঠ
গ. ধন + ঈ = ধনী
ঘ. হাত + অল = হাতল

কর্ম-অনুশীলন

১. একটি পোস্টার পেপারে নিচের সংজ্ঞাগুলো সাইন পেন দ্বারা লিপিবদ্ধ কর।

প্রত্যয়	:
কৃৎ প্রত্যয়	:
তদ্ধিত প্রত্যয়	:
প্রকৃতি	:
ক্রিয়া-প্রকৃতি	:
নাম-প্রকৃতি	:

২. প্রদত্ত শব্দগুলোর প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করে নির্দেশমতো নিচের ছকে সাজাও :

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দর্শনীয়		
দেশীয়		
গন্তব্য		
উচ্চতর		
নীলিমা		

৭. বাক্য

বাক্যের সাধারণ গঠন : উদ্দেশ্য ও বিধেয়

হ্যাপি একটি পুতুল বানাতে চায়।

কাকিমা বলাইকে খুব ভালোবাসতেন।

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড।

তখন আমার বয়স তেরো বছরের বেশি নয়।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা?

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য। উপরের বাক্যগুলোতে পূর্ণাঙ্গ ও অর্থপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ একত্রে মিলিত হওয়ার কারণেই বক্তব্য স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বা অন্বয় যেমন আছে, তেমনি আছে গঠনগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বক্তব্যের অর্থবহতা। সুতরাং কোনো ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে ধরনের একক উক্তিই ব্যাকরণ শাস্ত্রে বাক্য হিসেবে পরিচিত।

সংজ্ঞা : যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

যদি বলা হয় —

১. 'মৌলি একটি ... ।'
২. 'চাও মতো কবিতা ফুলের কি লিখতে তুমি?'
৩. 'মাছগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।'

এগুলো বাক্যের মধ্যে পড়ে না। কারণ 'মৌলি একটি' বললে মনের ভাব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'চাও মতো কবিতা ফুলের কি লিখতে তুমি?' এ ক্ষেত্রে অন্বিত পদগুলো খুবই বিযুক্ত। আর 'মাছগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।' – বললে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ, মাছ কখনো আকাশে উড়তে পারে না। উদাহরণগুলো বাক্য হিসেবে সার্থক হবে, যখন বলা হবে —

১. মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়।

২. তুমি কি ফুলের মতো কবিতা লিখতে চাও?

৩. পাখিগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বাক্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। আর সুসংহত করার জন্য প্রয়োজন যোগ্যতা ও আসত্তি। সুতরাং একটি সার্থক বাক্যের ভিত্তি আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটি

বিষয়ের কোনো একটির অভাব ঘটলে বাক্য নিরর্থক হয়ে পড়ে। সুতরাং সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যেমন :

১. আকাঙ্ক্ষা;

২. যোগ্যতা;

৩. আসত্তি।

১. **আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তা-ই আকাঙ্ক্ষা।** যেমন : 'আমি গিয়ে দেখলাম'— এতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। যখন বলা হয় — 'আমি গিয়ে দেখলাম তারা চলে গেছে।' এখন এটি একটি বাক্য হলো। কেননা, এ কথা বলার পরে আর কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

২. **যোগ্যতা : বাক্যের মধ্যকার পদসমূহের অন্তর্গত ও ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা।** বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে বন্যা হয়। এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কিন্তু 'গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে বন্যা হয়।' — বললে বাক্যটি অসংলগ্ন মনে হবে এবং ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ প্রখর রৌদ্রে কখনো বন্যা হয় না।

৩. **আসত্তি : বাক্যের পদগুলোকে সঠিক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করার নাম আসত্তি।** অথবা, বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি।

ছুটিতে ঢাকা তারা পুজোয় যাবেন— এতে একটি সম্পূর্ণ বাক্যের সবগুলো পদই আছে, কিন্তু আসত্তির অভাবে বাক্য হয়নি। পদগুলো অর্থসংগতি রক্ষা করে ঠিকমতো সাজালেই বাক্য হবে। তারা পুজোর ছুটিতে ঢাকা যাবেন।

সাধারণত প্রতিটি বাক্যের দুটি প্রধান অংশ থাকে : ১. উদ্দেশ্য ও ২. বিধেয়

১. উদ্দেশ্য : বাক্যের যে অংশে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে।

২. বিধেয় : বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন : শ্যামা স্কুলে যায়।

এখানে 'শ্যামা' উদ্দেশ্য এবং 'স্কুলে যায়' বিধেয়। কারণ বাক্যটিতে 'শ্যামা' সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই 'শ্যামা' পদটি উদ্দেশ্য। বিধেয় হচ্ছে বাক্যের 'স্কুলে যায়' অংশটি। কারণ 'স্কুলে যায়' কথাটি শ্যামা সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিধেয় অংশে অবশ্যই একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।

ভাষার সৌন্দর্য বর্ধনে কিংবা বক্তব্যের স্পষ্টতার জন্য বাক্য সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়। বাক্যকে সম্প্রসারিত করতে হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পূর্বে এবং পরে সেগুলোর পরিপোষক হিসেবে নানা রকম শব্দ যোগ করতে হয়। তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারণের রয়েছে কতিপয় নিয়ম।

সাধারণত বাক্যের কর্তৃকারকই মূল উদ্দেশ্য হয়। উদ্দেশ্যটি বিশেষ্য পদ হলে বিশেষণ বা অন্য কোনো পদ বা পদসমষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ করা যায়। পক্ষান্তরে, সমাপিকা ক্রিয়াই বিধেয় অংশের মূল।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারণ

বাক্যে 'উদ্দেশ্য' প্রথমে ও 'বিধেয়' পরে বসে। বাক্য দীর্ঘ হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত হয়। যেমন:

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
রকিবের	ভাই	এসেছে
অত্যাচারী	রাজা	নিহত হয়েছে

বিধেয়ের সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
ময়না	ভালো জামগুলো	খেয়ে ফেলেছে
তিনি	যেভাবেই হোক	আজ আসবেন

বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ (সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য)

গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা :

১. সরল বাক্য **২. জটিল বা মিশ্র বাক্য** ও **৩. যৌগিক বাক্য।**

১. সরল বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন :

ফুল ফুটেছে।

ছেলেরা খেলা করে।

এখানে 'ফুল' এবং 'ছেলেরা' কর্তা বা উদ্দেশ্য এবং 'ফুটেছে', 'খেলা করে' সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয়।

২. জটিল বা মিশ্র বাক্য

যে বাক্যের মধ্যে একটি প্রধান বাক্য থাকে এবং একাধিক বাক্যকে প্রধান বাক্যের ওপর নির্ভরশীল দেখা যায়, তাকে **জটিল বা মিশ্র বাক্য** বলে।

অথবা, অন্যভাবে বলা যায়, যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে।

যেমন : যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে।

যিনি সৎ পথে চলেন, তিনি সুখী হন।

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ড বাক্য
যে পরিশ্রম করে,	সে-ই সুখ লাভ করে।
যিনি সৎ পথে চলেন,	তিনি সুখী হন।

৩. যৌগিক বাক্য

পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য মিলিত হয়ে যখন একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তখন তাকে **যৌগিক বাক্য** বলে। যেমন :

তিনি অর্থশালী কিন্তু শিক্ষিত নন।

হিমেল নিয়মিত পড়াশোনা করে,তাই সে প্রথম হয়।

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো ও, এবং, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি, সুতরাং, অতএব, যেহেতু, যেন প্রভৃতি অব্যয়যোগে সংযুক্ত থাকে।

বাক্য গঠনের নিয়ম

বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে এবং বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দকে বলা হয় পদ। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ বা পদ সাজানোর সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। বাক্যে পদ সংস্থাপনার এ পদ্ধতিকেই বাক্যের **পদ সংস্থাপন রীতি** বা **পদক্রম** বলা হয়। ভাষার শুদ্ধ ও সার্থক প্রয়োগের জন্য পদ সংস্থাপনরীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বাক্যে পদের এলোমেলো ব্যবহার হলে মনের ভাব সার্থকভাবে প্রকাশিত হয় না। যেমন : 'ভাই দুই আমরা যাই ঢাকা' বললে কোনো অর্থ বোঝা যায় না, কিন্তু ঐ শব্দগুলো এভাবে পদক্রম অনুযায়ী সাজালে অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন : 'আমরা দুই ভাই ঢাকা যাই।'

বাক্যে পদ বসানোর কতিপয় প্রচলিত নিয়ম এখানে দেখানো হলো। যেমন :

১. বাক্যে সবচেয়ে প্রচলিত পদবিন্যাস হচ্ছে কর্তা প্রথমে, কর্ম মাঝে এবং ক্রিয়া শেষে। যেমন :

   আমি বই পড়ি। সে বাড়ি যায়।

২. ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন :

   রানা ভুকরে কাঁদছে। রহিত দ্রুত হাঁটছে।

৩. বাক্যে কর্ম থাকলে ক্রিয়া বিশেষণ কর্মের আগে বসে। যেমন :

   মামুন নীরবে বই পড়ছে। শিক্ষক জোরে চাবুক কষছেন।

৪. সময়বাচক ও স্থানবাচক পদ কর্মের আগে বসে। যেমন :

   কাল কলেজ বন্ধ ছিল। আমি বৃহস্পতিবার ঢাকা যাব।

৫. না-বোধক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন :

   আমি খাইনি। কে পড়া শেখেনি?

৬. প্রশ্নবোধক সর্বনাম ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন :

   আপনি কী চান? আকাশে কী দেখছ?

৭. বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। যেমন :

ছেলেটা বুদ্ধিমান। লোকটি বোকা।

৮. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পরেও বসে। যেমন :

মুখটি তোমার কিন্তু সুন্দর। প্রাণ তার খুব শক্ত।

তবে মনে রাখতে হবে, এই পদবিন্যাস অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। বক্তার মনোভাব, বলার বিশেষ ধারা বা স্টাইল ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদির ওপর নির্ভর করে পদবিন্যাস রীতি কেমন হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকে?

ক. ২ টি
খ. ৩ টি
গ. ৪ টি
ঘ. ৫ টি

২। বাংলা বাক্যে ক্রিয়া পদ সাধারণত কোথায় বসে?

ক. বাক্যের শুরুতে
খ. বাক্যের মাঝে
গ. বাক্যের শেষে
ঘ. বাক্যের যে কোনো স্থানে

কর্ম-অনুশীলন

১। একটি সার্থক বাক্যের 'আকাঙ্ক্ষা', 'যোগ্যতা' ও 'আসত্তি' গুণের আলোচনা একটি পোস্টারে পরিসজ্জিত কর।

৮. বিরামচিহ্ন

কমা ও ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার

লিখিত বাক্যে ছেদ বা বিরাম বোঝানোর জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণত ছেদচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন বলা হয়। বাক্যের অর্থ ঠিক ঠিক বোঝানোর জন্য বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক জায়গায় অল্প সময় কিংবা বেশি সময় থামার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বাক্যের শেষে তো অবশ্যই থামতে হয়। এই থামার সাধারণ নাম বিরাম।

আমরা যখন কথা বলি, তখন একটি বাক্যের সবটুকু অংশ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি না। ফুসফুসে বায়ু সঞ্চয়ের বা ফুসফুসকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য শ্বাসযন্ত্র মাঝে মাঝে থামে। তবে এই থামার মধ্যে রয়েছে একটি নিয়মের ধারাবাহিকতা। কেননা, না থেমে একনাগাড়ে বিরামহীনভাবে কথা বলে গেলে অর্থের বিপত্তি ঘটতে পারে। যেমন : 'তুমি ওখানে যেয়ো না গেলেই গণ্ডগোল হবে।'

বাক্যটিতে যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত সেখানে গেলেই গণ্ডগোল হবে। কিন্তু বাক্যটিতে যদি প্রয়োজনীয় বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাহলে অর্থটিই পাল্টে যায় : তুমি ওখানে যেয়ো, না গেলেই গণ্ডগোল হবে।

আবার বিরামচিহ্ন অন্যভাবে বিন্যস্ত করলে অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে : তুমি ওখানে যেয়ো না, গেলেই গণ্ডগোল হবে।

যেকোনো ভাষায় লেখ্য-রূপে বিরামচিহ্নের ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং লেখার ক্ষেত্রে বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ এবং তার অর্থকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে ছেদ বা বিরামচিহ্ন বলে। বিরামচিহ্ন বক্তব্যকে বা লেখার ভাষাকে বোধগম্য, সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত করে।

ছেদ বা বিরামচিহ্নের কাজ :

১. বাক্যে ব্যবহৃত পদগুচ্ছকে ভাব অনুসারে অর্থবহ করা।

২. বাক্যাংশ সগ্রথিত ও পৃথক করা।

৩. বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশ করা।

বিরামচিহ্নের পরিচয় :

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরামচিহ্নগুলোর নাম, আকার ও বিরামের সময় উল্লেখ করে নিচে একটি তালিকা দেওয়া হলো :

ক্রমিক	বিরামচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতিকাল
১	কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় লাগে।
২	সেমিকোলন	;	১ (এক) বলার দ্বিগুণ সময়কাল।
৩	দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	।	১ (এক) সেকেন্ড কাল পরিমাণ।
৪	জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	ঐ
৫	বিস্ময়চিহ্ন	!	ঐ
৬	কোলন	:	ঐ
৭	কোলন ড্যাশ	:—	ঐ
৮	ড্যাশ	—	ঐ
৯	হাইফেন	-	কোনোরূপ বিরতির প্রয়োজন নেই।
১০	ইলেক বা লোপচিহ্ন	'	ঐ
১১	উদ্ধৃতিচিহ্ন	" "	১ (এক) বলতে যে সময় লাগে।
১২	ব্র্যাকেট বা বন্ধনীচিহ্ন	( )	কোনো রূপ বিরতির প্রয়োজন নেই।
		{ }	ঐ
		[ ]	ঐ
১৩	ধাতু দ্যোতক চিহ্ন	√	ঐ
১৪	পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন	<	ঐ
১৫	পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন	>	ঐ
১৬	সমান চিহ্ন	=	ঐ
১৭	বর্জনচিহ্ন	...	ঐ
১৮	সংক্ষেপণ চিহ্ন	.	ঐ

বর্তমান অধ্যায়ে **কমা** (,) ও **ঊর্ধ্বকমা** (') সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১০৫৬

১. **কমা (,)** : কমা-কে বাংলায় পাদচ্ছেদ বলা হয়। কমার মূল কাজ পূর্ণ একটি বাক্যকে ভাবানুসারে একাধিক অংশে ভাগ করা। যেকোনো রচনায় দাঁড়ি (।) ছাড়া অন্য সব বিরামচিহ্নের মধ্যে কমার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। 'কমা' সংশ্লিষ্ট পদের পর নিচের দিকে ব্যবহৃত হয়। রচনার ধরন এবং ভাব পরিস্ফুটনে লেখকের আকাঙ্ক্ষার ওপরে কমার ব্যবহার নির্ভরশীল।

কমা (,)-র বিরতিকাল ১ (এক) বলতে যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু পরিমাণ।

কমা (,) ব্যবহারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. বাক্যে অর্থ-বিভাগ দেখাবার জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন : উন্নতি চাও, উন্নতি পাবে পরিশ্রমে।

২. বাক্যে একই পদবিশিষ্ট একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে শেষ পদটি ছাড়া বাকিগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক কমা ব্যবহার করে একজাতীয় পদকে পৃথক করা হয়। যেমন : বিশেষ্য পদের পরে : সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার — মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করেছেন।

৩. একজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে কমা ব্যবহার করে তাদের আলাদা করতে হয়। যেমন : হিমেল ঘরে ঢুকল, বইপত্র রাখল, জামাকাপড় ছাড়ল, তারপর বিশ্রাম নিল।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির পূর্বে কমা বসে। যেমন : সুনীল বলল, 'আমার বাবা বাড়ি নেই।'

৫. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে। যেমন : বিশাখা, এদিকে এসো।

৬. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে 'কমা' বসে। যেমন : যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই কেবল এ কথা বিশ্বাস করে।

৭. উপাধিক্রমের মধ্যে 'কমা' ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কারো নামের শেষে একাধিক ডিগ্রি থাকলে কমা বসে। যেমন : ফয়সাল আহমেদ, এমএ, পিএইচডি।

কমার উদাহরণ :

বিশেষণ পদের পরে কমার উদাহরণ : সৎ, বিনয়ী, অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী ছাত্ররাই জীবনে সাফল্য লাভ করে।

সর্বনাম পদের পরে কমার উদাহরণ : তুমি, আমি, সে—আমরা তিনজনই ঢাকা যাব।

ক্রিয়াপদের পরে কমার উদাহরণ : এলেন, দেখলেন, চলে গেলেন।

২. **ঊর্ধ্বকমা (')** : যতগুলো বিরামচিহ্ন আছে, তন্মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিরামচিহ্ন। ঊর্ধ্বকমা পদের মধ্যবর্তী কোনো একটি বর্ণের ওপরে জায়গা দখল করে নেয়। ঊর্ধ্বকমার কোনো বিরতিকাল নেই। এই চিহ্নকে 'ইলেক' বা 'লোপচিহ্ন' নামে অভিহিত করা হয়। ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার বর্তমানে খুবই কমে গেছে। তবে পুরনো বাংলা রচনায়, বিশেষত ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত-রূপে ব্যাপক হারে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হতো। নিচে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহারের কতিপয় ক্ষেত্র উদাহরণসহ দেখানো হলো :

১. ঊর্ধ্বকমার পুরনো ব্যবহার সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষার সাধুরীতির ক্রিয়া, সর্বনাম এবং কিছু সংখ্যাশব্দে চলিতরীতির সংক্ষিপ্ত-রূপ নির্দেশ করতে ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার হতো। যেমন :

ক্রিয়ার উদাহরণ :

সাধুরীতি (ক্রিয়ার দীর্ঘরূপ)	**চলিতরীতি** (ক্রিয়ার সংক্ষিপ্তরূপ)
হইতে	হ'তে
উপরে	'পরে
করিয়াছি	ক'রেছি

সর্বনামের উদাহরণ :

সাধুরীতি (সর্বনামের দীর্ঘরূপ)	**চলিতরীতি** (সর্বনামের সংক্ষিপ্তরূপ)
তাহার	তা'র
তাহাদের	তা'দের

সংখ্যাশব্দের উদাহরণ :

সাধু সংখ্যাশব্দের পূর্ণরূপ	**চলিত সংখ্যাশব্দের রূপে উর্ধ্বকমা**
দুইটি	দু'টি
একশত	একশ'

২. অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উর্ধ্বকমা : অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থবিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থাকলে সে ক্ষেত্রে উর্ধ্বকমার ব্যবহার হয়। যেমন : 'তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী।'

৩. অব্দসংখ্যা সংক্ষেপণে উর্ধ্বকমা : কিছুসংখ্যক অব্দসংখ্যা বিভিন্ন কারণে এতটাই তাৎপর্য মণ্ডিত ও সুপরিচিত থাকে যে বাক্যের মধ্যে তা পুরোটা না লিখলেও বোঝানো যায়। যেমন:

'৫২-র ভাষা আন্দোলন। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

বিরামচিহ্ন প্রয়োগের কতিপয় নমুনা

১. রে পথিক রে পাষাণ হৃদয় পথিক কী লোভে এত ত্রস্তে দৌড়াইতেছ কী আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ এ শিরে হায় এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কী

বিরামচিহ্নের প্রয়োগ :

রে পথিক! রে পাষাণ হৃদয় পথিক! কী লোভে এত ত্রস্তে দৌড়াইতেছ? কী আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়! এ শিরে তোমার প্রয়োজন কী?

২. আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না তাহার সে ঝুলি নাই তাহার সে লম্বা চুল নাই তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম কহিলাম কি রে রহমত কবে আসিলি?

বিরামচিহ্নের প্রয়োগ :

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম। কহিলাম, "কি রে রহমত, কবে আসিলি?"

৩. যে শব্দকে ভালোবাসে খুব শব্দকে আদর করে করে যে খুব সুখ পায় সে-ই হতে পারে কবি কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধভরা কথা বলতে চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে

বিরামচিহ্নের প্রয়োগ :

যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে যে খুব সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধভরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। **বিরাম চিহ্নের কাজ হলো-**

i. বাক্যকে ভাব অনুসারে অর্থবহ করা
ii. বাক্যাংশ সংগ্রথিত ও পৃথক করা
iii. বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

কর্ম-অনুশীলন

১। প্রদত্ত বিরামচিহ্নগুলোর 'আকৃতি' ও বিরতিকাল নিচের ছকে লিপিবদ্ধ কর :

বিরামচিহ্ন	আকৃতি	বিরতিকাল
কমা		
সেমিকোলন		
দাঁড়ি		
কোলন		
ড্যাশ		
হাইফেন		
প্রশ্নবোধক চিহ্ন		
বিস্ময়চিহ্ন		
ধাতু দ্যোতক চিহ্ন		

৯. বানান

বানানের নিয়ম : ণত্ব ও ষত্ব-বিধান

ভাষা প্রবহমান ও পরিবর্তনশীল। প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল বানান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাগ্‌ধ্বনিকে বর্ণ বা হরফের সাহায্যে লিখিত রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে বানান। বানান মূলত শব্দমধ্যস্থ বর্ণসমূহের বিশ্লেষণ বা ধারাবাহিক বর্ণনা হলেও বানানরীতি ব্যাকরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো ভাষার মৌলিক শব্দের গাঠনিক রূপ কী ধরনের হবে কিংবা যৌগিক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে বানানের নিয়মে কোনো পরিবর্তন আসবে কি না, তা জানার একমাত্র উপায় বানানরীতি।

একই শব্দের একাধিক বানান বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরনো। বাংলা ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বানানের কোনো সুনির্ধারিত নিয়ম না থাকায় একই শব্দের একাধিক বানান চলে এসেছে। বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' –এর প্রথম সংস্করণ এবং ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালে বাংলা বানানের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রণয়ন করে। এ নিয়ম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। ভাষার সামগ্রিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য বানানের নিয়ম জানা প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার বহুদিন ধরে নানা উৎসজাত শব্দের সমাবেশে গড়ে উঠেছে। উৎসগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি— এই প্রধান পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এই পাঁচ ধরনের শব্দের মধ্যে 'তৎসম', 'অর্ধ-তৎসম' ও 'তদ্ভব' শব্দ সংস্কৃত উৎসজাত। দেশি শব্দগুলো প্রাক্‌-আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি অনার্য জাতির ভাষা থেকে এসেছে। বিদেশি বা বৈভাষিক শব্দসমূহ আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ, তুর্কি, ইংরেজি, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষা থেকে আগত।

ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংস্কৃত থেকে সরাসরি যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলোই তৎসম শব্দ। 'তৎ' বলতে বোঝায় 'সংস্কৃত'। অর্থাৎ যা সংস্কৃতের মতো তা-ই তৎসম।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে যেসব শব্দ তৎসম, কেবল সেগুলোর বানানে মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ ও মূর্ধন্য-ষ প্রয়োগের বিশেষ নিয়ম রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, দন্ত্য-ন এবং মূর্ধন্য-ণ -এর মধ্যে ধ্বনিগত বা উচ্চারণগত কোনো পার্থক্য নেই। তদ্রুপ দন্ত্য-স এবং মূর্ধন্য-ষ-এর মধ্যেও ধ্বনিগত বা উচ্চারণগত কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু বানানের ক্ষেত্রে এদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগবিধি বা ব্যবহার রয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে কীভাবে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়ে যায় এবং কীভাবে দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়ে যায়, তা জানা প্রয়োজন।

ণত্ব-বিধান

যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে দন্ত্য-ন -এর পরিবর্তে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়, তাকে ণত্ব-বিধান বলে। অথবা, তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকে ণত্ব-বিধান বলে। যেমন : ঋণ, তৃণ, হরণ, করণ, চরণ, ভাষণ, ভূষণ, শোষণ, লক্ষণ ইত্যাদি।

ণত্ব-বিধানের নিয়মাবলি

১. তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ —এই তিনটি বর্ণের পরে এবং ঋ-কার, র-ফলা, রেফ, ক্ষ-এর পরে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

(ক) ঋ বা ঋ-কার (<)-এর পর মূর্ধন্য-ণ :

ঋণ, ঘৃণা, তৃণ, মসৃণ।

(খ) র -এর পর মূর্ধন্য-ণ :

বরণ, কিরণ, উচ্চারণ, চরণ, বিতরণ, হরণ, জাগরণ, ব্যাকরণ, নিবারণ।

(গ) র-ফলা (্র)-র পর মূর্ধন্য-ণ :

আমন্ত্রণ, মুদ্রণ, মিশ্রণ, চিত্রণ, শ্রেণি।

(ঘ) রেফ (র্) -এর পর মূর্ধন্য – ণ :

অর্ণব, কর্ণ, পূর্ণ, জীর্ণ, বর্ণ, ঝর্ণা, স্বর্ণ, বর্ণনা, শীর্ণ।

(ঙ) ষ-এর পর মূর্ধন্য–ণ :

অন্বেষণ, দূষণ, বর্ষণ, ভাষণ, প্রেষণ, আকর্ষণ, ঘর্ষণ, বিশ্লেষণ, ভূষণ, শোষণ।

(চ) ক্ষ (ক্ + ষ)-এর পর মূর্ধন্য - ণ :

ক্ষণ, শিক্ষণ, রক্ষণ, প্রশিক্ষণ, লক্ষণ।

দ্রষ্টব্য : মূর্ধন্য-ণ মূর্ধন্য-ষ-এর পরে যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠন করলে তা ষ্ণ-এর রূপ নেয়। (ষ্ণ-এর বিশ্লিষ্ট রূপ হচ্ছে ষ্ + ণ)

উদাহরণ : উষ্ণ, ক্ষয়িষ্ণু, তৃষ্ণা, কৃষ্ণ, বর্ধিষ্ণু।

২. একই শব্দের মধ্যে ঋ, ঋ-কার (ৃ), র, রেফ (র্), র-ফলা (্র) অথবা ষ-এর যেকোনোটির পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং য য় হ কিংবা ং –এসব বর্ণের এক বা একাধিক বর্ণ থাকে, তবে তার পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

অর্পণ, কৃপণ, দর্পণ, হরিণ, বৃংহণ, শ্রবণ।

৩. যুক্তব্যঞ্জনে ট-বর্গের বর্ণগুলোর (ট ঠ ড ঢ) পূর্বে দন্ত্য-ন-এর পরিবর্তে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

কণ্টক, ঘণ্টা, কণ্ঠ, গুণ্ঠন, পণ্ডিত।

২০২৫

৪. প্র, পরা, পূর্ব, অপর -এগুলোর পর 'অহ্ন' শব্দ বসলে 'অহ্ন' শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

প্রাহ্ণ	(প্র + অহ্ন = প্রাহ্ণ)।	পরাহ্ণ	(পর + অহ্ন = পরাহ্ণ)।
পূর্বাহ্ণ	(পূর্ব + অহ্ন = পূর্বাহ্ণ)।	অপরাহ্ণ	(অপর + অহ্ন = অপরাহ্ণ)।

৫. কতকগুলো তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

অণু	কোণ	গণ্য	তূণ	পণ্য	বিপণি	লবণ
আপণ	গণ	গণিত	নগণ্য	পুণ্য	বীণা	লাবণ্য
কঙ্কণ	গণক	গুণ	নিক্কণ	ফণী	বেণু	শোণিত

ণত্ব-নিষেধ (বানানে দন্ত্য-ন)

১. যুক্ত ব্যঞ্জনে ত-বর্গের (ত থ দ ধ ন) পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

অন্ত, দুরন্ত, শান্ত, গ্রন্থি, পান্থ, বন্দুক।

২. ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, য়, হ কিংবা ং ব্যতীত অন্য বর্ণ থাকলে পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন :

অর্জন, বর্জন, দর্শন, বিসর্জন, গিন্নি, সোনা।

৪. বিদেশি শব্দের বানানে সর্বদা দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

আয়রন, ক্লোরিন, গ্রিন, ড্রেন, ইস্টার্ন, কেরানি, জার্মান, ফার্নিচার, সেকেন্ড।

৫. ক্রিয়াপদের বানানে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

করেন, করানো, ধরুন, ধরেন, পারেন।

৬. সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদে ঋ র ষ থাকলেও পর পদের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ না হয়ে অপরিবর্তিত থাকে। যেমন :

অগ্রনায়ক ত্রিনয়ন দুর্নাম মৃগনাভি সর্বনাম হরিনাম।

ষত্ব-বিধান

যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে দন্ত্য-স -এর পরিবর্তে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়, তাকে **ষত্ব-বিধান** বলে।

অথবা, তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ব-বিধান বলে। ঋষি, তৃষা, বর্ষ, বৃষ্টি, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

ষত্ব-বিধানের নিয়মাবলি

১. ঋ বা ঋ-কারের পরে দন্ত্য-স-এর পরিবর্তে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

কৃষক, কৃষ্ণ, ঋষি, কৃষাণ, তৃষা, কৃষ্ণা।

ব্যতিক্রম : কৃশ্ ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশতা, কৃশাঙ্গ, কৃশাঙ্গী, কৃশানু, কৃশোদর।

২. রেফ (ʼ)-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

আকর্ষণ, চিকীর্ষা, বর্ষণ, বিমর্ষ, মুমূর্ষু, ঈর্ষা, পর্ষদ, মহর্ষি, শীর্ষ।

ব্যতিক্রম : অর্শ, আদর্শ, দর্শন, পরামর্শ, বর্শা, স্পর্শ ইত্যাদি।

৩. ট এবং ঠ-এর পূর্বে যুক্ত দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

ষ্ + ট = ষ্ট

অষ্ট নষ্ট বৃষ্টি সৃষ্টি পুষ্টি মুষ্টি হৃষ্ট।

ষ্ + ঠ = ষ্ঠ

কাষ্ঠ গোষ্ঠ বলিষ্ঠ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সুষ্ঠু।

৪. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

ই-কারান্ত উপসর্গ

অভিষেক অভিষঙ্গ পরিষদ প্রতিষেধক বিষাদ

অভিষিক্ত নিষুপ্ত প্রতিষ্ঠান বিষয় বিষম।

উ-কারান্ত উপসর্গ

অনুষঙ্গ অনুষঙ্গী অনুষ্ঠান সুষম সুষুপ্ত সুষুপ্তি।

ব্যতিক্রম : অভিসার, অভিসন্ধি, অভিসম্পাত ইত্যাদি।

৫. সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার বা উ-কারের পর ক খ প ফ-এর যেকোনো একটি থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

নিষ্প্রভ (নিঃ + প্রভ)। নিষ্কর (নিঃ + কর)।

নিষ্ফল (নিঃ + ফল)। বহিষ্কার (বহিঃ + কার)।

উঃ + [ক / খ / প / ফ] = উষ্ + [ক / খ / প/ ফ]

আয়ুষ্কাল (আয়ুঃ + কাল)। দুষ্কৃত (দুঃ + কৃত)। চতুষ্পদ (চতুঃ + পদ)।

৭. সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

কল্যাণীয়েষু শ্রদ্ধাস্পদেষু স্নেহাস্পদেষু বন্ধুবরেষু সুজনেষু।

৮. কতকগুলো তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

অভিলাষ দূষণ ভাষা ঈষৎ তুষার

বিষয় শেষ পাষাণ বিষ মানুষ।

ষত্ব-নিষেধ (বানানে দন্ত্য-স)

১. তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না, দন্ত্য-স হয়। যেমন : মিনসে।

২. অ, আ বর্ণে বিসর্গ (ঃ) থাকলে অতঃপর ক, খ, প, ফ থাকলে সন্ধিতে বিসর্গের স্থানে দন্ত্য-স হয়। যেমন :

নমস্কার (নমঃ + কার) তিরস্কার (তিঃ + কার) মনস্কাম (মনঃ + কাম)

৩. বিদেশি শব্দে, বিশেষ করে ইংরেজি শব্দে ং ঃ উচ্চারণস্থলে স্ট হয়। যেমন :

আগস্ট স্টেশন ফটোস্ট্যাট স্টুডিও মাস্টার
স্টেডিয়াম।

৪. 'সাৎ' প্রত্যয়ের দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন :

অগ্নিসাৎ ধূলিসাৎ ভূমিসাৎ।

৫. সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ না হয়ে দন্ত্য-স হয়। যেমন :

কল্যাণীয়াসু মাননীয়াসু সুজনীয়াসু

পূজনীয়াসু সুচরিতাসু সুপ্রিয়াসু।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (নমুনা)

১। বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ?

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
গ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ. বাংলা একাডেমি

২। নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

ক. বরণ
খ. চরণ
গ. ধরণ
ঘ. হরণ

কর্ম-অনুশীলন

১। নিচের উদাহরণগুলো সমজাতীয়তার ভিত্তিতে একই গুচ্ছে সাজাও এবং প্রতিটি গুচ্ছের বিপরীতে ণত্ব-বিধানের সংশ্লিষ্ট নিয়মটি লেখ। উদাহরণ : ঋণ, কণ্টক, দর্পণ, তৃণ, প্রণাম, অপরাহ্ণ, চন্দ্রায়ণ, পরিণাম, কণ্ঠ, বাণিজ্য, পূর্বাহ্ণ, পরায়ণ, গ্রহণ, বর্ণ, পণ্য, ভাষণ, মাণিক্য, উষ্ণ, হরিণ, বিশ্লেষণ, উত্তরায়ণ, গণ।

প্রদত্ত শব্দ	যে নিয়মে মূর্ধন্য-ণ হয়েছে

২। নিচের উদাহরণগুলো সমজাতীয়তার ভিত্তিতে একই গুচ্ছে সাজাও এবং প্রতিটি গুচ্ছের বিপরীতে ষত্ব-বিধানের সংশ্লিষ্ট নিয়মটি লেখ। উদাহরণ : কষ্ট, অভিষেক, নষ্ট, ভাষা, অনুষ্ঠান, চতুষ্পদ, ঋষি, মিষ্টি, আবিষ্কার, তৃষ্ণা, পরিষদ, বৃষ, আষাঢ়, দুষ্প্রাপ্য, জিগীষা, বহিষ্কার, অনুষঙ্গ।

প্রদত্ত শব্দ	যে নিয়মে মূর্ধন্য-ষ হয়েছে

১০. শব্দার্থ

একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

ভাষার রহস্যের কোনো শেষ নেই। বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলো বাক্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এ শ্রেণির শব্দগুলোকে ভিন্নার্থক শব্দ বলে। যেমন : 'কাপড়টির রং **কাঁচা**,' **কাঁচা** আম খেতে টক'– এ ক্ষেত্রে 'কাঁচা' শব্দটি ভিন্ন দুটি বাক্যে যথাক্রমে 'অস্থায়ী' ও 'অপক্ব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও অর্থের বিস্তারে ভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আভিধানিক অর্থের বাইরে পদের এ ধরনের বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ অর্থের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। নিচে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখানো হলো :

অঙ্ক

১. **অঙ্ক** (গণিত) : যুথি **অঙ্কে** কাঁচা।

২. **অঙ্ক** (নাটকের অংশবিশেষ) : নাটকটি পাঁচ **অঙ্কে** সমাপ্ত।

৩. **অঙ্ক** (রেখা) : **অঙ্ক**-পাত করে সাদা খাতাটি নষ্ট করো না।

৪. **অঙ্ক** (সংখ্যা) : টাকার **অঙ্ক** কত হবে?

অর্থ

১. **অর্থ** (টাকাকড়ি) : **অর্থই** অনর্থের মূল।

২. **অর্থ** (উদ্দেশ্য) : আমার কাছে আসার **অর্থ** কী?

৩. **অর্থ** (অর্থ-উপার্জনে সহায়ক) : পাট বাংলাদেশের **অর্থকরী** ফসল।

উঠা

১. **উঠা** (উদিত হওয়া) : 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য **উঠেছে** রক্ত-লাল রক্ত লাল'।

২. **উঠা** (জাগা) : ঘুম থেকে **উঠে** হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

৩. **উঠা** (আরোহণ) : পর্বত শৃঙ্গে **উঠা** খুবই কষ্টকর।

কথা

১. **কথা** (অঙ্গীকার) : কথা দিয়ে কখনো **কথা** ভঙ্গ করো না।

২. **কথা** (উপদেশ) : জ্ঞানী-গুণীর **কথা** সকলেরই মেনে চলা উচিত।

৩. **কথা** (অনুরোধ) : আমার পক্ষে তোমার **কথা** রাখা সম্ভব নয়।

৪. **কথা** (প্রসঙ্গ) : কাজের **কথা** বললেই তুমি চুপ করে থাক।

কাজ

১. **কাজ** (চাকরি) : দায়িত্বহীনতার জন্য তার **কাজটি** গেছে।

২. **কাজ** (সুফল) : তোমার উপদেশে আমার বড়ই **কাজ** হয়েছে।

৩. **কাজ দেওয়া** (চাকরি দেওয়া) : **কাজ** দিয়ে আপনি আমার বড় উপকার করেছেন।

৪. **কাজ** (কারুকার্য) : পাথরের উপর কী অপূর্ব **কাজ!**

কাঁচা

১. **কাঁচা** (অপক্ব) : আমগুলো এখনো **কাঁচা**।

২. **কাঁচা** (অসিদ্ধ) : আদিম মানুষেরা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করত।

৩. **কাঁচা** (অপটু) : চিঠিটা **কাঁচা** হাতের লেখা।

৪. **কাঁচা** (অস্থায়ী) : কাপড়টির রং একেবারেই **কাঁচা**।

৫. **কাঁচা** (মাটির তৈরি) : **কাঁচা** ঘর-বাড়ি বন্যায় টেকে না।

কান

১. **কান** (অঙ্গবিশেষ) : তার **কান** দুটি যেন খরগোশের কানের মতো খাড়া।

২. **কান কাটা** (নির্লজ্জ) : লোকটি **কান কাটা** স্বভাবের।

৩. **কান পাতা** (আড়ি দেওয়া) : কারো কথায় **কান** পাতা ঠিক নয়।

গা

১. **গা** (গাত্র, শরীর) : গরমে সারা **গায়ে** ঘামাচি উঠেছে।

২. **গা কাঁপা** (ভয় বোধ করা) : ছিনতাইকারীর খপ্পরে পড়ে তার **গা কাঁপছে**।

৩. **গা জ্বালা করা** (ক্রোধের উদ্রেক হওয়া) : মিথ্যা অভিযোগে **গা জ্বালা করছে**।

৪. **গা ঢাকা দেওয়া** (পলায়ন করা) : পুলিশের ভয়ে সন্ত্রাসীরা **গা ঢাকা দিয়েছে**।

চলা

১. **চলা** (অগ্রসর হওয়া) : সৈন্যদল জোর কদমে এগিয়ে **চলছে**।

২. **চলা** (অতিবাহিত হওয়া) : সময় অলক্ষে **চলে** যায়।

৩. **চলা** (জীবন নির্বাহ করা) : অল্প আয়ে **চলা** খুব কঠিন।

চোখ

১. **চোখ রাখা** (দৃষ্টি রাখা) : **ছেলেটির** ওপর চোখ রেখো।

২. **চোখ ওঠা** (রোগ বিশেষ) : **চোখ ওঠাতে** সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে ।

৩. **চোখ খোলা** (সতর্ক হওয়া) : যা দিনকাল পড়েছে **চোখ খোলা** রাখা ছাড়া উপায় নেই।

৪. **চোখ রাঙ্গানো** (রাগ দেখানো) : আমাকে **চোখ রাঙ্গিয়ে** লাভ নেই।

৫. **চোখের বালি** (চক্ষুশূল) : মেয়েটি সৎমার **চোখের বালি**।

ছাড়া

১. **ছাড়া** (থামা) : তিন দিন পর তার জ্বর **ছেড়েছে**।

২. **ছাড়া** (যাত্রা করা) : খুব ভোরেই সিলেটের উদ্দেশ্যে পারাবত ট্রেনটি **ছাড়ে**।

৩. **ছাড়া** (নিরাশ হওয়া) : ওর ব্যাপারে আমি হাল **ছেড়ে** দিয়েছি।

৪. **ছাড়া** (ডাকে দেওয়া) : গতকাল চিঠিটা **ছাড়া** হয়েছে।

পড়া

১. **পড়া** (অধ্যয়ন করা) : মনোযোগ দিয়ে **পড়াশোনা** করলে অবশ্যই ভালো ফল করতে পারে।

২. **পড়া** (ক্ষমা অর্থে) : পায়ে **পড়ি** এবার আমাকে মাফ করে দিন।

৩. **পড়া** (কমে আসা) : এত দিনে তার রাগ **পড়েছে**।

পা

১. **পা চাটা** (অতি হীনভাবে তোষামোদ করা) : সমাজে **পা চাটা** লোকের অভাব নেই।

২. **পা বাড়ানো** (যেতে উদ্যত হওয়া) : তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে **পা বাড়াল**।

৩. **পায়ে ধরা** (বিনীতভাবে অনুরোধ করা) : আপনার পায়ে ধরছি আমার কাজটি করে দিন।

৪. **পা** (চরণ, পদ) : বল খেলতে গিয়ে টুটুল **পায়ে** ব্যথা পেয়েছে।

পাকা

১. **পাকা** (পক্ব) : '**পাকা** জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ।'

২. **পাকা** (অভিজ্ঞ) : তিনি একজন **পাকা** লোক।

৩. **পাকা** (ঝানু হওয়া) : অল্প বয়সেই ছেলেটি বুদ্ধিতে **পেকেছে** । ২০২৫

৪. **পাকা** (স্থায়ী) : শাড়িটার রঙ **পাকা**।

৫. **পাকা** (ইটের তৈরি) : **পাকা** বাড়িঘর বেশি দিন টেকে।

ফল

১. **ফল** (উদ্ভিদজাত শস্য) : জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচুর **ফল** পাওয়া যায়।

২. **ফল** (লাভ, কোনো কাজের পরিণাম) : 'কি **ফল** লভিনু হায়।'

৩. **ফল** (কার্যসিদ্ধি) : অব্যাহত চেষ্টায় **ফললাভ** হবেই।

৪. **ফল** (ফলন) : লিচুগাছে এবার খুব **ফল** ধরেছে।

বড়

১. **বড়** (বৃহৎ) : জাহাজটি বেশ **বড়**।

২. **বড়** (শ্রেষ্ঠ) : নিজেকে সব কাজে **বড়** মনে করা ঠিক নয়।

৩. **বড়** (সম্ভ্রান্ত) : নীপা খুব **বড়** বংশের মেয়ে।

মন

১. **মন** (মনোযোগ) : **মন** দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।

২. **মন বসা** (ভালো লাগা) : এত দিনে তার লেখাপড়ায় **মন বসেছে**।

৩. **মন কষাকষি** (মনোমালিন্য) : অনেক দিন যাবৎ তাদের দুই বন্ধুর মধ্যে **মন কষাকষি** চলছে।

৪. **মনেপ্রাণে** (ঐকান্তিকভাবে) : **মনেপ্রাণে** দেশকে ভালোবাসা উচিত।

মাথা

১. **মাথা** (মেধা, বুদ্ধি) : ছেলেটির বেশ **মাথা** আছে।

২. **মাথা** (আগা) : গাছের **মাথায়** পাখিরা বাসা করেছে।

৩. **মাথা** (শ্রেষ্ঠ) : বুদ্ধিজীবীরা দেশের **মাথা**

৪. **মাথা** (মস্তক, শির) : অন্যায়ের কাছে কখনোই **মাথা** নোয়াবে না।

৫. **মাথা ধরা** (শিরঃপীড়া) : হঠাৎ করে খুব **মাথা ধরেছে**।

মুখ

১. **মুখ** (বদন, আনন) : লঙ্কার রাজা রাবণের দশ **মুখ**।

২. **মুখ** (প্রবেশ পথ) : একসময় তারা গুহা **মুখে** গিয়ে পৌঁছাল।

৩. **মুখ** (সূচনা) : কাজের **মুখে** বাধা দিয়ো না।

৪. **মুখ ফোলানো** (অভিমান) : মেয়েটি কথায় কথায় **মুখ** ফুলায়।

৫. **মুখ** রাখা (মান রাখা) : এ ছেলে একদিন বংশের **মুখ** রাখবেই।

হাত

১. **হাত** (প্রভাব) : গ্রামের লোকের ওপর তার **হাত** আছে।

২. **হাত করা** (বশে আনা) : মাতব্বর টাকা দিয়ে তাকে **হাত** করেছে।

৩. **হাত পাতা** (ভিক্ষা করা) : **হাত পাতা** খুবই ঘৃণার কাজ।

৪. **হাতবদল** (হস্তান্তর) : এ জমিটি বহুবার **হাতবদল** হয়েছে।

৫. **হাতপাকা** (দক্ষ) : সেলাইয়ের কাজে তিনি একজন **হাতপাকা** লোক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (নমুনা)

১। নিচের কোন বাক্যে কাঁচা অর্থ অপক্ব ?

ক. চিঠিটা কাঁচা হাতের লেখা
খ. কাপড়টির রং একেবারেই কাঁচা
গ. আমগুলো এখনো কাঁচা
ঘ. কাঁচা ঘরবাড়ী বন্যায় টেকে না

২। নিচের কোন বাক্যে হাত শব্দটি ভিক্ষা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. হাত পাতা খুবই ঘৃণার কাজ
খ. জামাটি বহু হাতবদল হয়েছে
গ. গ্রামের লোকের ওপর তার হাত আছে
ঘ. মাঝির হাত পাকা

কর্ম-অনুশীলন

কাঁচা, কান, মাথা, হাত, উঠা–এ শব্দগুলো দ্বারা প্রত্যেকটির তিনটি করে ভিন্নার্থে প্রয়োগ দেখাও :

বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে এমন কতকগুলো শব্দ আছে, অর্থ ও ভাবের দিক থেকে যেগুলোর রয়েছে বিপরীত অর্থজ্ঞাপক রূপ। যার মাধ্যমে আমরা প্রদত্ত শব্দটির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বুঝে থাকি।

যেমন : '**আলো** বলে, **অন্ধকার** তুই বড় কালো।'

'কোথায় **স্বর্গ** কোথায় **নরক** কে বলে তা বহুদূর?'

'**উত্তম** নিশ্চিন্তে চলে **অধমের** সাথে।'

'**ঊর্ধ্ব** গগনে বাজে মাদল '**নিম্নে** উতলা ধরণী তল।'

উল্লিখিত বাক্যসমূহে **আলো, স্বর্গ, উত্তম, ঊর্ধ্ব** শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ হলো যথাক্রমে : **অন্ধকার, নরক, অধম** ও **নিম্ন**। সুতরাং একটি শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দকে **বিপরীতার্থক** শব্দ বলে।

বিপরীতার্থক শব্দ রচনাকে সুন্দর করে এবং ভাব প্রকাশের মাধুর্য বৃদ্ধি করে বক্তব্যকে প্রবাহমান সৌন্দর্য দান করে। মোটকথা, মনের ভাব সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য এবং ভাষার সৌন্দর্য পরিবর্ধনের প্রয়োজনে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিচে কতিপয় শব্দের বিপরীতার্থক রূপ প্রদত্ত হলো :

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ	অধম	উত্তম	অনুকূল	প্রতিকূল
অনন্ত	সান্ত	অধীন	স্বাধীন	অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অর্পণ	গ্রহণ	অর্থ	অনর্থ	অনুরাগ	বিরাগ
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	অনুরক্ত	বিরক্ত	অর্জন	বর্জন
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	অজ্ঞান	সজ্ঞান	অসীম	সসীম
আকাশ	পাতাল	আদান	প্রদান	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আগমন	নির্গমন	আকুঞ্চন	প্রসারণ	আদর	অনাদর
আদি	অন্ত	আয়	ব্যয়	আবির্ভাব	তিরোভাব
আবৃত	অনাবৃত	আমদানি	রপ্তানি	আপন	পর
আসল	নকল	আত্মীয়	অনাত্মীয়	আস্তিক	নাস্তিক
ইন্দ্রিয়	অতীন্দ্রিয়	আবশ্যক	অনাবশ্যক	ইহলোক	পরলোক
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	ঈর্ষা	প্রীতি	উচিত	অনুচিত

কোমল	কঠিন	উর্বর	অনুর্বর	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
কৃত্রিম	আসল	কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	কুৎসিত	সুন্দর
ক্রয়	বিক্রয়	কর্কশ	কোমল	কৃশ	স্থূল
ক্লেশ	আরাম	কৃপণ	দয়ালু	কুৎসা	প্রশংসা
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু	ক্ষীণ	পুষ্ট
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গৃহী	সন্ন্যাসী	গুপ্ত	প্রকাশিত, ব্যক্ত
জাগ্রত	নিদ্রিত	জঙ্গম	স্থাবর	জটিল	সরল
জ্বলন্ত	নিভন্ত	জোয়ার	ভাটা	জ্যোৎস্না	অন্ধকার
তিক্ত	মধুর	তিরস্কার	পুরস্কার	তীক্ষ্ণ	ভোঁতা
দীর্ঘ	হ্রস্ব	দাতা	গ্রহীতা	দুর্দিন	সুদিন
দ্যুলোক	ভূলোক	ধার্মিক	পাপিষ্ঠ	ধনী	দরিদ্র
ন্যূন	অধিক	নশ্বর	অবিনশ্বর/শাশ্বত	নবীন	প্রবীণ
নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস	নিরক্ষর	সাক্ষর	নীরস	সরস
প্রাচ্য	প্রতীচ্য	প্রশস্তি	নিন্দা	প্রসারণ	সংকোচন
পার্থিব	অপার্থিব	পূর্ব	পশ্চিম	পণ্ডিত	মূর্খ
পূর্ণ	শূন্য	পুষ্ট	ক্ষীণ	ব্যর্থ	সফল
ব্যষ্টি	সমষ্টি	বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ	বন্ধন	মুক্তি
ভদ্র	অভদ্র	ভর্ৎসনা	প্রশংসা	ভৃত্য	প্রভু
মহৎ	নীচ	মহার্ঘ	সুলভ	মূক	বাচাল
লাভ	ক্ষতি	শত্রু	মিত্র	শীতল	উষ্ণ
শিষ্ট	অশিষ্ট	শোক	আনন্দ	শীত	গ্রীষ্ম
শ্রী	বিশ্রী	সরল	বক্র	সাকার	নিরাকার
সুশ্রী	কুশ্রী	স্বাধীন	পরাধীন	সঞ্চয়	অপচয়
সিক্ত	শুষ্ক	স্বর্গ	নরক	সূক্ষ্ম	স্থূল
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	স্থাবর	অস্থাবর	সুলভ	দুর্লভ
হ্রস্ব	দীর্ঘ	হর্ষ	বিষাদ	হলন্ত	অকারান্ত

বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা বাক্যগঠন :

	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ		বাক্যে প্রয়োগ
১.	অগ্র	পশ্চাৎ	:	এ ব্যাপারে **অগ্র-পশ্চাৎ** বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
২.	অর্পণ	গ্রহণ	:	একজন দায়িত্ব **অর্পণ** করলেন আরেকজন দায়িত্ব **গ্রহণ** করলেন।
৩.	আকাশ	পাতাল	:	তার কথা ও কাজে **আকাশ-পাতাল** ব্যবধান।
৪.	আদি	অন্ত	:	তোমার কথার **আদি-অন্ত** কিছুই বুঝতে পারলাম না।
৫.	আসল	নকল	:	ভেজালে বাজার ছেয়ে গেছে, **আসল-নকল** চেনাই মুশকিল।
৬.	কোমল	কঠিন	:	তার স্বভাব যেমন **কোমল** তেমনি **কঠিন**।
৭.	ক্রয়	বিক্রয়	:	বিদেশি পণ্যে বাজার সয়লাব, দেশি পণ্যের **ক্রয়-বিক্রয়** তেমন একটা নেই।
৮.	তিক্ত	মধুর	:	জীবনে **তিক্ত-মধুর** বহু অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত থাকে।
৯.	অর্থ	অনর্থ	:	**অর্থ অনর্থের** মূল।
১০.	আয়	ব্যয়	:	**আয়** বুঝে **ব্যয়** করা উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। **অনুরাগ এর বিপরীত শব্দ কোনটি?**
ক. রাগান্বিত
খ. রাগের প্রকাশ
গ. বিরাগ
ঘ. অনুরক্ত

কর্ম-অনুশীলন

৪। মূল শব্দের বিপরীতে শূন্য ঘরে সঠিক বিপরীতার্থক শব্দটি ডান পাশ থেকে বেছে নিয়ে লেখ :

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	অগোছালো বিপরীতার্থক শব্দ
[ ]	অনুকূল	সরল

☐	আর্দ্র	বাদশা
☐	আবদ্ধ	অমৃত
☐	উত্থান	মহাজন
☐	কনিষ্ঠ	প্রতিকূল
☐	কুটিল	শুষ্ক

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দ আছে, যাদের উচ্চারণ এক অথবা প্রায় একই কিন্তু বানান ও অর্থ ভিন্ন। লিখিত রূপ ছাড়া মৌখিক উচ্চারণে এসব শব্দের অর্থ-পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। যেমন : 'অন্ন ও অন্য'। 'অন্ন' শব্দটির অর্থ হলো 'ভাত' আর 'অন্য' শব্দটির অর্থ হলো 'অপর'। এ ধরনের শব্দসমূহকে **সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ** বলে। ভাবের যথাযথ অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সমোচ্চারিত শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা আবশ্যক। কারণ এ ধরনের শব্দের উচ্চারণ এক হলেও বানানে রয়েছে ভিন্নতা এবং প্রতিটি শব্দের মূলও পৃথক। এ জন্য শব্দগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে অর্থ-পার্থক্য ঘটে।

নিচে উদাহরণ দেওয়া হলো :

অংশ (ভাগ) — এ জমিতে তারও **অংশ** রয়েছে।
অংসে (কাঁধ) — **অংসে** বোঝা নিয়ে লোকজন হাটে যাচ্ছে।

অনু (পশ্চাৎ) — সকল সৈন্যই অধিনায়কের **অনুগমন** করল।
অণু (বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ) — পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে **অণু** বলে।

অন্ন (ভাত) — **অন্নহীনে** অন্ন দান কর।
অন্য (অপর) — অনুগ্রহ করে **অন্যদিন** দেখা করুন।

অবিরাম (অনবরত) — বর্ষার বৃষ্টিধারা **অবিরাম** ঝরছে।
অভিরাম (সুন্দর) — বর্ষার **অভিরাম** দৃশ্যে মন ভরে যায়।

অবিধান (অনিয়ম) — অফিস-আদালত সর্বত্রই **অবিধান** ছড়িয়ে পড়েছে।
অভিধান (শব্দকোষ) **অভিধান** খুলে শব্দটির অর্থ জেনে নাও।

অর্ঘ (মূল্য) — বইগুলো আমি অর্ধেক **অর্ঘে** কিনেছি।
অর্ঘ্য (পূজার উপকরণ) — সরস্বতীর পাদমূলে তারা **অর্ঘ্য** নিবেদন করল।

অশ্ব (ঘোড়া) — আরবীয় **অশ্ব** পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ।
অশ্ম (পাথর) — বাড়িটি মূল্যবান **অশ্ম** দিয়ে তৈরি।

আপণ (দোকান) — ঢাকা শহরের **আপণগুলো** বেশ সুসজ্জিত।
আপন (নিজ) — **আপন** পাঠে মন দাও।

আষাঢ় (মাসবিশেষ) — **আষাঢ়** মাস, চারদিকে থৈ থৈ পানি।
আসার (প্রবল বৃষ্টিপাত) — বর্ষার **আসারে** মাঠ-ঘাট প্লাবিত হলো।

উপাদান (উপকরণ) — পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক **উপাদান** দিয়ে তৈরি।
উপাধান (বালিশ) — শিশুটি **উপাধানে** মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে।

কুজন (খারাপ ব্যক্তি) — **কুজনের** সংসর্গ পরিত্যাজ্য।
কূজন (পাখির ডাক) — পাখির **কূজনে** তাদের ঘুম ভাঙল।

কোণ (দুই সরলরেখার মিলনস্থান, দিক) — ত্রিভুজের তিন **কোণের** সমষ্টি দুই সমকোণ
কোন (অনির্ধারিত কোনোটি) — তারা **কোন** দিকে গিয়েছে জানি না।

কপাল (ললাট, মাথার খুলি) — **কপালের** লিখন যায় না খণ্ডন।
কপোল (গাল) — '**কপোল** ভিজিয়া গেল নয়নের জলে।'

কমল (পদ্ম) — ঝিলের জলে **কমল** ফুটে আছে।
কোমল (নরম) — '**কোমল** চরণ আলতা ধোয়া।'

কুল (বংশ) — মেয়েটির মাতৃ**কুল** খুবই সম্ভ্রান্ত।
কূল (নদীর তীর) — পদ্মার **কূলেই** তাদের গ্রাম।

গাঁ (গ্রাম) — 'ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের **গাঁ**।'
গা (শরীর) — মেয়েটির **গায়ে** লাল জামা বেশ মানিয়েছে।

জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ) — তার **জ্যেষ্ঠ** ভ্রাতা একজন শিক্ষক ।
জ্যৈষ্ঠ (মাসবিশেষ) — ফলের প্রাচুর্যে **জ্যৈষ্ঠ** মাস মধুমাস নামে পরিচিত।

দিন (দিবস) — সাত **দিনে** এক সপ্তাহ তিরিশ **দিনে** এক মাস।
দীন (দরিদ্র) — **দীনে** দয়া কর।

দ্বীপ (জলবেষ্টিত স্থান) — সেন্ট মার্টিন **দ্বীপ** সৌন্দর্যের লীলাভূমি।
দ্বিপ (হাতি) — পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে বন্য **দ্বিপ** আছে।

২০২৫

নীর (জল) — ঝর্ণার **নীর** খুবই স্বচ্ছ ও সুপেয়।
নীড় (পাখির বাসা) — পাখিরা এখন **নীড়** রচনায় ব্যস্ত।

পানি (জল) — **পানির** স্তর ক্রমশই নিচে নেমে যাচ্ছে।
পাণি (হাত) — সরস্বতী দেবীর **পাণিতে** বীণা শোভমান।

বিনা (ব্যতীত) — 'দুঃখ **বিনা** সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'
বীণা (বাদ্যযন্ত্র) — তিনি একজন প্রখ্যাত **বীণা**বাদক।

ভাসা (ভাসমান থাকা) — নৌকাগুলো জলের ওপর **ভেসে** বেড়াচ্ছে।
ভাষা (ভাব প্রকাশক উক্তি বা সংকেত) — মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা **ভাষা**।

ভারি (খুব) — বর্ষার রূপ **ভারি** মনোমুগ্ধকর।
ভারী (বেশি ওজন) — অতটুকু ছেলের মাথায় অত **ভারী** বোঝা চাপিয়েছ কেন?

মুখ (মুখমণ্ডল) — **মুখ** ভার করে বসে আছ কেন?
মূক (বোবা) — মেয়েটি জন্ম থেকেই **মূক**।

যতি (বিরাম স্থান) — **যতি** হলো বাক্যের অর্থ ঠিক ঠিক বোঝানোর জন্য বিরাম স্থান।
যতী (মুনি, সন্ন্যাসী) — **যতীগণ** সংসার ত্যাগ করে নির্জনে পরমেশ্বরের ধ্যান করেন।

লক্ষ (শত সহস্র) — একশ সহস্রে এক **লক্ষ**।
লক্ষ্য (উদ্দেশ্য) — সুনির্দিষ্ট **লক্ষ্য** ছাড়া জীবনে সফলকাম হওয়া যায় না।

শয্যা (বিছানা) — জীবন কুসুম-**শয্যা** নয়, বাধা-বিঘ্ন পেরিয়েই পথ চলতে হয়।
সজ্জা (বেশভূষা) — মেয়েটি নতুন **সজ্জায়** লজ্জা পাচ্ছে।

শুচি (পবিত্র) — সুচিন্তা ছাড়া মন **শুচি** হয় না।
সূচি (বিষয় তালিকা) — বইয়ের শুরুতে **সূচিটা** দেখে নাও।

স্বর্গ (দেবলোক) — কোথায় **স্বর্গ** কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?
সর্গ (অধ্যায়, পরিচ্ছেদ) — বইটিতে দশটি **সর্গ** আছে।

সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন)–নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বাক্ষর (সই, দস্তখত)-দরখাস্তে আবেদনকারীর স্বাক্ষর নেই।

কর্ম-অনুশীলন

নিচের সমোচ্চারিত শব্দগুলোর অর্থের পার্থক্য দেখাও :

প্রদত্ত শব্দ	অর্থ	প্রদত্ত শব্দ	অর্থ
অণু অনু		শয্যা সজ্জা	
দিন দীন		লক্ষ লক্ষ্য	
দ্বিপ দ্বীপ		নীড় নীর	
পাণি পানি		অশ্ব অশ্রু	

এক কথায় প্রকাশ

বাক্য ভাষার বৃহত্তম একক। আমরা কথা বলার সময় কিংবা লেখার সময় অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো বাক্য বা বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত করে থাকি। একাধিক পদ, এমনকি একটি পূর্ণ বাক্যকেও অনেক সময় একটি শব্দে প্রকাশ করা যায়। একাধিক পদকে সংক্ষিপ্ত করে একটি পদে প্রকাশ করার রীতিকে **এক কথায় প্রকাশ** বা **বাক্য সংকোচন** বলে। বস্তুত, বহুপদকে একপদে পরিণত করার মধ্য দিয়ে বাক্য বা বাক্যাংশের সংকোচন কাজ সম্পন্ন হয়।

ভাষাবিদ মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, 'একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। এটি বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশেরই নামান্তর।'

সংজ্ঞার্থ: অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য বা বাক্যাংশকে সংকুচিত করে প্রকাশ করাকে বা একপদে পরিণত করাকে বাক্য সংকোচন বলে।

বাক্য সংকোচনের ফলে বাক্য সংক্ষিপ্ত ও শ্রুতিমধুর হয়। সংক্ষেপে ও সংহতভাবে ভাব প্রকাশ করা হলে রচনার গুণ বা মান বৃদ্ধি পায়। নিচের অংশটুকু লক্ষ করি :

বসন্তকালের **দিনের শেষ ভাগ**। সামনে **জনবিরল বিশাল প্রান্তর**। **দমন করা যায় না** এমন উৎসাহ সবার মনে। কিছুক্ষণ চলতেই আমরা **চার রাস্তার মিলনস্থলের** দেখা পেলাম। **একতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র** বাজিয়ে একজন বাউল আসছেন।

উপরের বর্ণনায় যেসব শব্দ মোটা করে দেওয়া আছে, সেগুলোকে সংক্ষেপে প্রকাশ করে দেখি কেমন হয় :

বসন্তকালের **অপরাহ্ণ**। সামনে **তেপান্তর**। **অদম্য** উৎসাহ সবার মনে। কিছুক্ষণ চলতেই আমরা **চৌরাস্তার** দেখা পেলাম। **একতারা** বাজিয়ে একজন বাউল আসছেন।

লক্ষণীয়, উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও শ্রুতিমধুর হয়েছে।

বাক্য সংকোচনের নিয়ম

বাক্য বা বাক্যাংশ একাধিক পদের সমষ্টি। একাধিক পদকে একপদে পরিণত করাই বাক্য সংকোচন। নিচের রীতিগুলো অবলম্বন করে বাক্য সংকোচন করা হয় :

১. **প্রত্যয়যোগে বাক্য সংকোচন :** ডুবে যাচ্ছে যা— ডুবন্ত (√ডুব্ + অন্ত)। এখানে ('√ডুব্') ক্রিয়া-প্রকৃতির সঙ্গে 'অন্ত' প্রত্যয়যোগে 'ডুবন্ত' শব্দটি তৈরি হয়েছে।

২. **সমাসযোগে বাক্য সংকোচন :** পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক (অব্যয়ীভাব সমাস)। শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী (দ্বিগু সমাস)।

৩. **আভিধানিক শব্দের সাহায্যে বাক্য সংকোচন :** ময়ূরের ডাক = কেকা। হরিণের চামড়া = অজিন। অলংকারের ঝংকার = শিঞ্জন।

বাক্য সংকোচনের কতিপয় উদাহরণ :

অক্ষির সমক্ষে বর্তমান — **প্রত্যক্ষ**

অকালে পক্ব হয়েছে যা — **অকালপক্ব**

আয় বুঝে ব্যয় করে যে — **মিতব্যয়ী**

ইতিহাস রচনা করেন যিনি — **ঐতিহাসিক**

ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার — **আঁষটে**

উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে — **কৃতজ্ঞ**

উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না — **অকৃতজ্ঞ**

কোনো ক্রমেই যা নিবারণ করা যায় না — **অনিবার্য**

চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত — **চাক্ষুষ**

জীবিত থেকেও যে মৃত — **জীবন্মৃত**

নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার — **নশ্বর**

পা থেকে মাথা পর্যন্ত — **আপাদমস্তক**

মৃতের মতো অবস্থা যার — **মুমূর্ষু**

যা পূর্বে ছিল এখন নেই — **ভূতপূর্ব**

যা দীপ্তি পাচ্ছে — **দেদীপ্যমান**

যা জলে ও স্থলে চরে — **উভচর**

যা অতি দীর্ঘ নয় — **নাতিদীর্ঘ**

যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না — **বর্ণচোরা**

যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু — **বন্ধুর**

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে — **বর্ধিষ্ণু**

যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না — **বনস্পতি**

যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে — **হাতুড়ে**

যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে — **পরগাছা**

যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে — **অবিমৃশ্যকারী**

যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ — **শ্বাপদসংকুল**

যিনি বক্তৃতা দানে পটু — **বাগ্মী**

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা — **প্রত্যুদ্‌গমন**

হনন করার ইচ্ছা — **জিঘাংসা**

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (নমুনা)

১। **'কোথাও উঁচু কোথাও নিচু' এক কথায় প্রকাশ করলে কী হয়?**
ক. বন্ধুর
খ. উঁচু-নিচু
গ. অসমতল
ঘ. অমসৃণ

২। **যিনি বক্তৃতা দানে পটু তাকে এক কথায় কী বলে?**
ক. বক্তা
খ. বাচাল
গ. বাগ্মী
ঘ. মিতভাষী

কর্ম-অনুশীলন

১। বাম পাশের বাক্যগুলোর সঙ্কুচিত রূপ ডান পাশের ঘরে বসাও।

প্রদত্ত বাক্য	সঙ্কুচিত রূপ
১. অগ্রে জন্মেছে যে	
২. জয় করার ইচ্ছা	
৩. উপকার করার ইচ্ছা	
৪. জয়সূচক উৎসব	
৫. মধু পান করে যে	
৬. যিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত	
৭. শুভক্ষণে জন্ম যার	
৮. যার মরণাপন্ন অবস্থা	
৯. প্রিয় কথা বলে যে (নারী)	
১০. হাতির ডাক	

বাগ্‌ধারা

বাগ্‌ধারা মূলত বিশিষ্ট অর্থবোধক একধরনের বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ। 'বাগ্‌ধারা' শব্দের অর্থ কথা বলার 'বিশেষ ঢং' বা 'রীতি'। বাগ্‌ধারার সাহায্যে বিশেষ ধরনের অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ গঠিত হয়। বাগ্‌ধারা ইংরেজি 'ইডিয়ম' (Idiom) শব্দের সমার্থক।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই বিশিষ্টার্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাংলাতেও অজস্র বাগ্‌ধারা আছে। বাংলা ভাষার অনেক শব্দই তাদের নিজস্ব অর্থ ছাড়াও বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঙ্গিতবহ ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যমণ্ডিত। যেমন : 'অর্ধচন্দ্র' বলতে 'অর্ধেক চাঁদ' না বুঝিয়ে 'গলাধাক্কা' বোঝায়। অনুরূপ 'তাসের ঘর' বলতে 'তাস দ্বারা নির্মিত ঘর' না বুঝিয়ে 'ক্ষণস্থায়ী' কোনো কিছুকে বোঝায়। সুতরাং **আক্ষরিক অর্থকে ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাগ্‌ধারা বলে।**

বাগ্‌ধারা ভাষা ব্যবহারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। এর নেপথ্যে ব্যক্তিক ও সামাজিক নানা ঘটনা বা প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে থাকে। বাগ্‌ধারা ভাষার একটি গৌরবময় ঐতিহ্য। যে জাতির ভাষা যত প্রাচীন, সে জাতির ভাষায় বাগ্‌ধারার ব্যবহার তত বেশি। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। তাই বাঙালির মননগত অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য অজস্র বাগ্‌ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

বাগ্‌ধারা ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক। অর্থের স্পষ্টতায়, ভাবের ব্যঞ্জনায়, বক্তব্যের আকর্ষণ সৃষ্টিতে বাগ্‌ধারার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাগ্‌ধারার যথাযথ প্রয়োগে ভাষা সুললিত, সুষমামণ্ডিত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

নিচে সুপ্রচলিত কতকগুলো বাগ্‌ধারার বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো :

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – সমিতির জন্য কৃপণ কামাল মিয়ার কাছে চাঁদা চাওয়া **অরণ্যে রোদন** মাত্র।

অক্কা পাওয়া (মরে যাওয়া) – গণপিটুনিতে পকেটমার **অক্কা পেল**।

অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা) – বেয়াদব ছেলেটাকে **অর্ধচন্দ্র** দিয়ে বিদায় করে দাও।

অগাধ জলের মাছ (সুচতুর ব্যক্তি) – চৌধুরী সাহেব **অগাধ জলের মাছ**, তাঁর মারপ্যাঁচ ধরা মুশকিল।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – তুমি হলে **আমড়া কাঠের ঢেঁকি**, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।

আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) – বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে পলাশকে পঞ্চাশ টাকা **আক্কেল সেলামি** দিতে হলো।

আষাঢ়ে গল্প (আজগুবি গল্প) – এসব যে তোমার **আষাঢ়ে গল্প**, তা আমাদের জানা হয়ে গেছে।

উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) – ছেলেটা **উড়নচণ্ডী** না হলে পৈতৃক সম্পত্তি দুদিনেই নিঃশেষ করে দেবে কেন?

ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) – ফরহাদ **ইঁদুর কপালে**, তাই তো টাঁকশালের চাকরিটা হয়েও হলো না।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) – ছেলেটা **ইঁচড়ে পাকা** বলেই তো বড়দের সঙ্গে অমন করে তর্ক করছে!

এলাহি কাণ্ড (বিরাট ব্যাপার) – পুতুলের বিয়েতে এত বড় আয়োজন–এ দেখছি **এলাহি কাণ্ড**।

কলুর বলদ (একটানা খাটুনি) – **কলুর বলদের** মতো সংসারের পিছে সারা জীবন খাটলাম, কিন্তু লাভের লাভ কিছুই পেলাম না।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) – চোরটার **কৈ মাছের প্রাণ**, গণপিটুনি খেয়েও বেঁচে গেল।

খয়ের খাঁ (চাটুকার) – তুমি তো বড় সাহেবের **খয়ের খাঁ**, তোমার পদোন্নতি তো হবেই।

গোঁফ খেজুরে (অলস) – **গোঁফ খেজুরে** লোকের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়।

গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল) – এ অঙ্ক মিলবে না, কারণ **গোড়াতেই তো গলদ** রয়েছে।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) – আশা করেছিলাম বিদেশে যাব, এখন দেখছি সে **গুড়ে বালি**।

ঘোড়ার ডিম (অবাস্তব বস্তু) – পড়াশোনায় মনোযোগী না হলে পরীক্ষায় **ঘোড়ার ডিম** পাবে।

চোখের বালি (অপ্রিয় / চক্ষুশূল লোক) – মা-মরা ছেলেটি সৎ মায়ের **চোখের বালি**।

টনক নড়া (চৈতন্যোদয় হওয়া) – প্রথম সাময়িক পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় তার **টনক নড়ল**।

ঠোঁট কাটা (স্পষ্টভাষী) – আফাজ মিঞার মুখে কিছুই আটকায় না, **ঠোঁট কাটা** যাকে বলে।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) – চাকরি পেয়ে **ডুমুরের ফুল** হয়ে উঠলে যে— দেখাই পাওয়া যায় না।

ঢাকের কাঠি (মোসাহেব) – তুমি তো বড় সাহেবের **ঢাকের কাঠি**, তিনি যা বলেন তুমিও তাই বল।

তীর্থের কাক (সাগ্রহে প্রতীক্ষাকারী) – প্রবাসী ছেলের বাড়ি ফেরার প্রতীক্ষায় বাবা-মা **তীর্থের কাকের** মতো বসে আছেন।

থ বনে যাওয়া (স্তম্ভিত হওয়া) – তার কাণ্ড দেখে আমি তো **থ বনে** গেলাম।

দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – ম্যানেজারের সঙ্গে আজমল সাহেবের খুব **দহরম মহরম**।

দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – টাকা থাকলে **দুধের মাছির** অভাব হয় না।

ধামাধরা (চাটুকারিতা) – সমাজে **ধামাধরা** লোকের অভাব নেই।

নয় ছয় (অপচয়) – জাভেদ জমি বিক্রির টাকাগুলো **নয় ছয়** করে ফেলল।

পুকুর চুরি (বড় রকমের চুরি) – অসাধু কর্মচারীরা **পুকুর চুরি** করে ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়েছে।

বকধার্মিক/ বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড সাধু) – মুখে নীতিবাক্য আওড়ালেও লোকটা আসলে **বকধার্মিক/বিড়াল তপস্বী**।

ভরাডুবি (সর্বনাশ) – দোকানে আগুন লেগে ফজলু মিঞার **ভরাডুবি** হয়েছে।

ভিজে বিড়াল (কপটচারী) – সে একজন **ভিজে বেড়াল**, তাকে চেনা সহজ নয়।

যক্ষের ধন (কৃপণের কড়ি) – **যক্ষের ধনের** মতো সে তার টাকাকড়ি আগলে আছে, কাউকে দুই পয়সার সাহায্যও করে না।

রাঘব বোয়াল (সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি) – উচ্চপদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যদি **রাঘব বোয়াল** হয়, তবে দেশের উন্নতি হবে কেমন করে?

লেফাফাদুরস্ত (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি) – আলম মিঞা এমন **লেফাফাদুরস্ত** যে বাইরে থেকে দারিদ্র্য বোঝা যায় না।

শাঁখের করাত (উভয় সংকট) – সত্য বললে বাবা বিপদে পড়েন, আর মিথ্যে বললে মা বিপদে পড়েন– আমি পড়েছি **শাঁখের করাতে**।

শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ) – বড় সাহেব হারুনকে শাস্তি না দিয়ে দিলেন প্রমোশন, একেই বলে **শাপে বর**।

হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা) – জিনিসপত্র ছড়িয়ে ঘরটাকে তো একেবারে **হ-য-ব-র-ল** করে রেখেছ।

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) – **হাতের পাঁচ** এ কটি টাকা দিয়েই আমাকে বাকি কটা দিন চলতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। **'কৈ মাছের প্রাণ' বলতে কী বুঝায়?**
ক. যা সহজে মরে না
খ. এক জাতের মাছ
গ. মাছের প্রাণ স্থায়ী নয়
ঘ. কৈ মাছ খুব শক্তিশালী

২। **নিচের কোন বাক্যে অর্ধচন্দ্র বাগ্‌ধারার সঠিক প্রয়োগ হয়েছে?**
ক. বালকটিকে অর্ধচন্দ্র দেখাও।
খ. চোরটিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের করো।
গ. আকাশে অর্ধচন্দ্র দেখা যায়।
ঘ. মা শিশুকে অর্ধচন্দ্র দেখাচ্ছে।

নির্মিতি

রচনা

আমাদের জাতীয় পতাকা

ভূমিকা : জাতীয় পতাকা একটি স্বাধীন জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাই প্রতিটি স্বাধীন দেশ ও জাতিরই একটি জাতীয় পতাকা আছে। জাতীয় পতাকা দেশের সব মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। যেকোনো স্বাধীন দেশ বা জাতি তার জাতীয় পতাকাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে।

জাতীয় পতাকার আকার ও আকৃতি : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। পতাকার দৈর্ঘ্য যদি ৩০৫ সেন্টিমিটার (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেন্টিমিটার (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আমাদের জাতীয় পতাকার ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতীক : বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশে সকল ধর্মের মানুষের বসবাস রয়েছে। কিন্তু ধর্ম আলাদা হলেও সবার ভেতরে রয়েছে একই জাতিসত্তা। আর তা হলো বাঙালি জাতিসত্তা। বহু ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। লাল-সবুজের পতাকা আমাদের সে স্মৃতিকেই বহন করছে। এ পতাকা আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরে সব প্রজন্মের সামনে।

জাতীয় পতাকার বিশেষত্ব : আমাদের জাতীয় পতাকার সবুজ রং বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির দিকটিকে তুলে ধরেছে । লাল রং তুলে ধরেছে নবজাগরণের কথা। এছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এ দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে তার ইঙ্গিতও বহন করে লাল রং। মোটকথা, আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে জাতীয় পতাকা।

জাতীয় পতাকার গুরুত্ব : জাতীয় পতাকা আমাদের সকল বৈষম্য দূর করে দেয়। আমরা এ পতাকার ছায়াতলে একত্রে মিলিত হই। আমরা পরস্পরের মধ্যে সকল ভেদাভেদ ভুলে যাই। এছাড়া আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার প্রেরণাও আমরা জাতীয় পতাকা থেকে পাই। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয় পতাকা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। হিমালয়ের চূড়া থেকে শুরু করে আমাদের যে কোনো অর্জনেই জাতীয় পতাকা সবার আগে আমাদের হাতে উঠে আসে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক জাতীয় পতাকা। শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতের সকল কর্মপ্রেরণার উৎসও আমাদের জাতীয় পতাকা।

জাতীয় পতাকার সম্মান : জাতীয় পতাকার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। তাই একে সম্মান করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য স্থানে বা অনুষ্ঠানে যখনই জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হোক না কেন, তখনই দাঁড়িয়ে তার প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যে জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে না, সে সকলের ঘৃণার পাত্র। তাকে সকলে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে।

উপসংহার : জাতীয় পতাকা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত মর্যাদার ও সম্মানের। বুকের রক্ত দিয়ে হলেও এর সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের লক্ষ লক্ষ বীর শহিদ এ পতাকার জন্যই তাঁদের জীবনদান করেছেন। যখন নীল আকাশের মাঝে আমাদের এ পতাকা উড়তে থাকে, তখন তা দেখে গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়।

আমাদের গ্রাম

ভূমিকা : সবুজে শ্যামলে ভরা আমাদের এদেশের বেশির ভাগ স্থানজুড়ে রয়েছে গ্রাম। আমাদের এ গ্রামগুলো যেন সবুজের লীলাভূমি। গ্রামের সবুজ প্রকৃতি যেকোনো মানুষের হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেয়। গ্রামের শান্ত পরিবেশ মানুষের সকল ক্লান্তি দূর করে। গ্রামই এদেশের প্রাণ।

গ্রামের অবস্থান : আমাদের গ্রামের নাম রতনপুর। এটি ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার অন্তর্গত। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইছামতী নদী। নদীর দুপাশের প্রাকৃতিক শোভা এ গ্রামকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে। ঢাকা থেকে সড়ক পথে খুব সহজেই আমাদের গ্রামে আসা যায়।

গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য : আমাদের গ্রামখানি ছবির মতো। আম-জাম, কাঁঠাল-লিচু, নারিকেল-সুপারি, শিমুল-পলাশ, তাল-তমাল আর নানাজাতের গাছপালায় সুসজ্জিত আমাদের এই গ্রাম। ঝোপঝাড় লতাপাতার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সবার মন কেড়ে নেয়। পাখপাখালির কলকূজনে সব সময়ই মুখর থাকে গ্রামখানি। দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ, ধান-কাউনের হাতছানি, নিঝুম দুপুরে বটের ছায়ায় রাখালের বাঁশি উদাস করে মনপ্রাণ। দিঘী-ডোবা, বিল-ঝিল– কী এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সমাহার!

গ্রামের মানুষ : আমাদের গ্রামে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই সব মানুষ এখানে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে।

গ্রামের মানুষের জীবিকা : আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া কিছু জেলে এবং তাঁতিও এখানে রয়েছে। কিছু মানুষ লেখাপড়া শিখে শহরে চাকরি করে। তবে সে সংখ্যা নিতান্তই কম। এছাড়া কিছু মানুষ দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

গ্রামের অর্থনৈতিক উৎস : বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রামের মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে আমাদের গ্রামের চিত্র একটু ভিন্ন। গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারেরই একজন করে দেশের বাইরে থাকে। তাদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা এ গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করেছে। গ্রামের আয়ের আরেকটি বড় উৎস কুটির শিল্প। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নকশীকাঁথা, উলের তৈরি গালিচা, পাটের তৈরি নানা গৃহসজ্জার পণ্য তৈরি হয়। এগুলো শহরে বিক্রি করে গ্রামের মানুষ প্রচুর অর্থ আয় করে। এছাড়া কৃষিজাত পণ্য যেমন : ধান, পাট, গম ও নানা ধরনের সবজি তরকারি বিক্রি করেও গ্রামের মানুষ অর্থ রোজগার করে। প্রতি বুধবার গ্রামে হাট বসে। হাটে শহরের লোকজন এসে সরাসরি গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিজাত পণ্য সংগ্রহ করে।

গ্রামের প্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া একটি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। আরো রয়েছে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও দুটি বেসরকারি অফিস। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি মসজিদ, একটি মন্দির ও একটি গির্জা রয়েছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটি পোস্ট অফিস।

গ্রামের সংস্কৃতি : সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের গ্রাম খুবই উন্নত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এখানে নানা ধরনের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। যেমন : চৈত্র মাসের শেষে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, বৈশাখ মাসে বৈশাখি মেলা, অগ্রাণ মাসে নবান্ন অনুষ্ঠান, পৌষ মাসে পিঠার অনুষ্ঠান ইত্যাদি। গ্রামের মুসলিম ও হিন্দু বিয়েতে লোকজ গান, নাচ ও খাবারের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসে স্কুলে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবেও লোকজন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রামের অবদান : মহান মুক্তিযুদ্ধে এ গ্রামের মানুষের অবদান অনেক। এ গ্রামের মানুষের সাহসিকতা ও বীরত্বে পাকিস্তানি বাহিনী এ গ্রামে প্রবেশের খুব একটা সুযোগ পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলের দুজন আঞ্চলিক কমান্ডার এ গ্রামে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর গতি রোধ করার লক্ষ্যে এ গ্রামের এক ছেলে ব্রিজ ধ্বংস কতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। তাঁর এবং মুক্তিযুদ্ধে আরো যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে গ্রামে একটি শহিদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার : আমাদের রতনপুর গ্রাম আমাদের কাছে খুব প্রিয়। এ গ্রামের প্রকৃতি মায়ায় জড়ানো। রতনপুরের মানুষ সহজ-সরল ও অতিথিপরায়ণ। ইছামতী নদীর সৌন্দর্য এ গ্রামকে করেছে অন্য সব গ্রাম থেকে আলাদা। রতনপুর গ্রামের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে।

দর্শনীয় স্থান

ভূমিকা : ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসক এ দেশকে শাসন করেছেন। তাঁরা তৈরি করেছেন বিভিন্ন সুরম্য প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি। এগুলো এখন আমাদের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া আমাদের দেশ প্রাকৃতিকভাবেও মনোরম। এ দেশের বন, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গলও আমাদের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান : বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দিনাজপুরের কান্তজী মন্দির, নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নাটোরের দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন) ও রানি ভবানীর বাড়ি, পুঠিয়ার জমিদারবাড়ি, গাজীপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ি, ঢাকার আহসান মঞ্জিল, নারায়ণগঞ্জের সোনার গাঁ, কুমিল্লার ময়নামতি ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দিনাজপুরের রামসাগর, নাটোরের চলনবিল, নেত্রকোনার বিড়িসিরি, সিলেটের জাফলং, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত ইত্যাদি।

দর্শনীয় স্থান হিসেবে নাটোর : রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা শহর নাটোর। এর উত্তরে রয়েছে নওগাঁ ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলা, পূর্বে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে রাজশাহী জেলা

অবস্থিত। নাটোর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এখানে ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক উভয় ধরনের দর্শনীয় স্থান রয়েছে।

নাটোরের ঐতিহাসিক স্থান : ১৮৬৯ সালে নাটোর মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীকালে নাটোর পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়। প্রাচীন শহর হওয়ায় নাটোরে অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি ও ছোটতরফ রাজবাড়ি উল্লেখযোগ্য। রানি ভবানীর কীর্তি নাটোরের মানুষ এখনো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

রানি ভবানীর কীর্তি : একজন দক্ষ জমিদার প্রজাদরদি হিসেবে রানি ভবানীর নাম সর্বজনবিদিত। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজহিতৈষী ও উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি শত শত মন্দির, অতিথিশালা ও রাস্তা নির্মাণ করেন। প্রজাদের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য তিনি অনেকগুলো পুকুর খনন করেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন।

দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি : নাটোর শহর থেকে প্রায় ২.৪০ কিলোমিটার দূরে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি অবস্থিত। রাজা দয়ারাম রায় এ রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালে নাটোরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এতে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে দেশি-বিদেশি স্থপতি ও শিল্পীদের দ্বারা রাজা প্রমদানাথ রায় রাজবাড়িটি পুনর্নির্মাণ করেন। এ রাজবাড়ি প্রায় ৪৩ একর জমির উপর নির্মিত। সমস্ত রাজবাড়িটি উঁচু দেয়াল দ্বারা আবৃত। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখে একটি সিংহদ্বার রয়েছে। এ সিংহদ্বারের দুই প্রান্তে দুটি কামান রয়েছে এবং মাথার উপরে রয়েছে একটি সুদৃশ্য বড় ঘড়ি। মূল ভবনের ভেতরের সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র এখনো মানুষকে বিস্মিত করে। ভবনের পেছন দিকে রয়েছে একটি বাগান। এখানে দুষ্প্রাপ্য অনেক গাছ আছে। সমস্ত রাজবাড়িটি একটি গভীর ঝিল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান দিঘাপতিয়া রাজবাড়িকে 'দিঘাপতিয়া গভর্নর হাউস' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া রাজবাড়িকে 'উত্তরা গণভবন' নামে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ছোটতরফ রাজবাড়ি : নাটোর জেলার বঙ্গজল নামক স্থানে ছোটতরফ রাজবাড়ি অবস্থিত। রাজা চন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ রায়, জীতেন্দ্রনাথ রায় ও বীরেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে রাজবাড়িটি পরিচালিত হতো। বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে। ছোট তরফের ভেতরে অনেকগুলো গভীর পুকুর রয়েছে। রাজবাড়ির সীমার মধ্যে মন্দির রয়েছে সাতটি। এ ছাড়া দুটি বড় ভবন এবং বেশ কয়েকটি ছোট ভবন রয়েছে।

চলনবিল : নাটোরের প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে চলনবিল একটি। বর্ষার সময় চলনবিল পানিতে ভরে যায়। তখন এর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পর্যটক এখানে বেড়াতে আসে। চলনবিলের উপর নৌকায় ঘুরে তারা এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে।

নাটোরের কাঁচাগোল্লা : ঐতিহাসিকভাবে নাটোরের কাঁচাগোল্লা মিষ্টি সুপ্রসিদ্ধ। দুধ দ্বারা কাঁচাগোল্লা প্রস্তুত করা হয়। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী এ মিষ্টির খ্যাতি রয়েছে।

উপসংহার : শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো সুন্দর বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই। ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক উভয় দিক থেকেই আমাদের দেশ সমৃদ্ধ। আমরা অনেকেই টাকা খরচ করে দেশের বাইরের সৌন্দর্য দেখতে যাই। কিন্তু আমাদের দেশ যে সৌন্দর্যের লীলাভূমি তা হয়তো অনেকেই জানি না। দেশকে ভালোভাবে চিনে-জেনে দেশের সৌন্দর্য উপভোগে আমাদের তৎপর হওয়া উচিত ।

বাংলাদেশের নদনদী

ভূমিকা : কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশে অসংখ্য নদীর সমাবেশ দেখে একে 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন। ছোট-বড় প্রায় সাত শ নদী এ দেশকে ঘিরে রয়েছে। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক জনপদ। মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে নদীগুলো এ দেশ ঘিরে রেখেছে। তাই এদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদনদী : বাংলাদেশের সব নদীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা বেশ কঠিন কাজ। তবে এ দেশের প্রধান কিছু নদীর নাম আমাদের সবারই জানা। সেগুলো হলো : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী ও মাতামুহুরী।

পদ্মা : বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এর উৎপত্তি। ভারতে এ নদীর নাম গঙ্গা। মূলত গঙ্গা নদীর যে ধারাটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, তার নামই পদ্মা। এ নদী রাজশাহী জেলার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পদ্মার প্রধান শাখা নদীগুলো হচ্ছে : কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ। মহানন্দা পদ্মার প্রধান উপনদী।

মেঘনা : মেঘনা নদীর জন্ম আসামের পাহাড়ে। সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত স্রোত আজমিরিগঞ্জের কাছে এসে 'কালনী' নামে পরিচিতি পেয়েছে। শেষে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরববাজারের কাছে এসে এ নদী মেঘনা নাম ধারণ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস ও চাঁদপুরের ডাকাতিয়া মেঘনার দুটি প্রধান শাখা নদী। গোমতী, মনু, বাউলাই মেঘনার উপনদী।

যমুনা : যমুনার উৎস হিমালয় পর্বতে। যমুনা নদী গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখা নদী। ধরলা, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই যমুনার উপনদী।

কর্ণফুলী : কর্ণফুলী নদীর জন্ম আসামের লুসাই পাহাড়ে। রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার। কর্ণফুলী নদী অত্যন্ত খরস্রোতা। এ নদীর উপর বাঁধ দিয়েই নির্মিত হয়েছে কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে কর্ণফুলী কাগজ ও রেশম শিল্প-কারখানা। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হচ্ছে হালদা, বোয়ালখালী ও কাসালং।

ব্রহ্মপুত্র : হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবরে এ নদের উৎপত্তি। তিব্বতের পূর্ব দিক ও আসামের পশ্চিম দিক দিয়ে এ নদ প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বংশী ও শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা নদী। ধরলা ও তিস্তা এর উপনদী।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদ-নদীর প্রভাব : নদীর সঙ্গে আমাদের জীবন গভীরভাবে জড়িত। আমাদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নদীপথ। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র। আমাদের কৃষিক্ষেত্র অনেকাংশেই নদীর ওপর নির্ভরশীল।এ দেশের কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নদীকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম ।

নদ-নদীর উপকারিতা : বাংলাদেশকে সবুজে-শ্যামলে ভরে তোলার পেছনে নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর পানিতে বয়ে আসা পলি প্রাকৃতিকভাবে আমাদের মাটিকে উর্বর করেছে। আমাদের কৃষির অগ্রগতিতে তাই নদীর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও নদীগুলো মিঠা পানির মাছের অন্যতম উৎস। নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে অসংখ্য মানুষ। দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়েও মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়।এ ছাড়া পরিবহন-সংক্রান্ত কাজেও নদীকে ব্যবহার করা হয়। একশ্রেণির মানুষ এ কাজ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

নদ-নদীর অপকারিতা : নদীর কিছু অপকারিতাও আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষাকালে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তখন বন্যা দেখা দেয়। এ ছাড়া নদীর প্রবল স্রোতে ভাঙন শুরু হয়। কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রাম ভাঙতে ভাঙতে নদীর মাঝে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের ঘরবাড়ি, জমিজমা, গাছপালা, গবাদিপশু ও গৃহসামগ্রী। অনেক সময় নদীর প্রবল স্রোতে মানুষের জীবনহানিও ঘটে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ নদীভাঙনের শিকার হয়।

উপসংহার : নদ-নদী বাংলাদেশকে করেছে সমৃদ্ধ।এ দেশকে ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে। নদ-নদীগুলো এ দেশের গৌরব। তবে বর্তমানে সে গৌরব ম্লান হতে চলেছে। নদীগুলো ভরাট হয়ে হারিয়ে ফেলছে তাদের স্বাভাবিক গতিপথ। তাই এ বিষয়ে এখনই আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা : 'থাকব না ক বদ্ধ ঘরে/ দেখব এবার জগৎটাকে

কেমন করে ঘুরছে মানুষ/ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।'

(সংকল্প : কাজী নজরুল ইসলাম)

অনেক খ্যাতিমান কবির কবিতায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তিনি বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি, প্রেমের কবি। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান কোনো দিন ভুলবে না।

কবির জন্মপরিচয় : ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জৈষ্ঠ্য) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জায়েদা খাতুন। ছেলেবেলায় নজরুলের নাম ছিল দুঃখু মিয়া।

কবির শিক্ষাজীবন : ছোট থেকেই নজরুল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। গ্রামের মক্তব থেকে তিনি প্রাইমারি পাস করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহের ত্রিশালের দরিরামপুর হাইস্কুলে কিছুকাল পড়ালেখা করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে। এখানে দশম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টে সৈনিক হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার এখানেই ইতি ঘটে।

কবির কর্মজীবন : নজরুল বারো বছর বয়সে লেটোর গানের দলে যোগ দেন। সেখান থেকে তিনি সামান্য কিছু রোজগার করতেন। এরপর তিনি আসানসোলের এক রুটির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে চাকরি নেন। বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর কাব্যসাধনায় তিনি পুরোপুরি নিয়োজিত হন। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নবযুগ, লাঙল ও ধূমকেতু পত্রিকা। পত্রিকাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

কবির কাব্যপ্রতিভা : ১৯২০ সাল থেকে নজরুল পুরোপুরি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'মুক্তি'। কিন্তু যে কবিতা তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় তার নাম 'বিদ্রোহী'। পরবর্তীকালে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি রচনা করে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের ব্যঙ্গ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

সাহিত্যকীর্তি : কাজী নজরুল ইসলাম খুব অল্প সময় সাহিত্য সাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, চক্রবাক, দোলনচাঁপা, ফণীমনসা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি প্রায় দুই হাজারের মতো গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সুরের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। মানুষ এখনো শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর গান শোনে।

সংবর্ধনা, সম্মাননা ও পুরস্কার : ১৯২৯ সালে কলকাতা অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে জাতির পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে নজরুলকে সভাপতির পদে সমাসীন করে সম্মান দেখানো হয়। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

কবির অসুস্থতা : ১৯৪২ সালে কবি মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হলেও সুস্থ হননি তিনি। এর পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন নির্বাক।

কবির বাংলাদেশে আগমন : ১৯৭২ সালে অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয়। পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়।

মৃত্যু : বাংলাদেশে অবস্থানকালে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়। প্রতিবছরই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সমাধিতে সবাই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

উপসংহার : বাঙালির গর্ব নজরুল। বাঙালির প্রিয় কবি নজরুল। তিনি তাঁর সৃষ্টির দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব পেয়েছেন। বাঙালি জাতি চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তাঁর সাহিত্য যুগ যুগ ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমাদের প্রেরণা জোগাবে। নজরুল শুধু একটি সময়ের কবি নন। তিনি সব সময়ের সব মানুষের কবি।

কী ধরনের বই আমার পড়তে ভালো লাগে

ভূমিকা : গল্পকার ও ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন, 'আমার মধ্যে উত্তম বলে যদি কিছু থাকে তার জন্য আমি বইয়ের কাছে ঋণী।' সত্যিকার অর্থেই বই মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনার জন্ম দেয়। মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে। তাই তো বই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

আমার বই পড়ার শুরুর কথা : মায়ের কাছ থেকে বর্ণমালা শেখার পর পাঁচ বছর বয়সে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের পাঠ্যবই তখন আমার সঙ্গী হয় । কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই আমি বই পড়তাম। ছোটবেলায় 'ঠাকুরমার ঝুলি' আমাকে খুব আনন্দ দিত। এ গল্পগুলো আমি নিজে পড়ে যতটা আনন্দ পেতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেতাম শুনে। এ ছাড়া ঈশপের গল্প, মোল্লা নাসিরউদ্দীনের গল্প, বীরবলের গল্প ও গোপাল ভাঁড়ের গল্প আমার পড়তে ভালো লাগত। কিন্তু এখন আমি এ রকম বই পড়ি না। গোয়েন্দা গল্প, মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছাড়াও আরও নানা রকমের গল্পের বই এখন আমার নিত্যসঙ্গী।

আমার ভালো লাগার বই : গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। গোয়েন্দা চরিত্রগুলোর মধ্যে 'ফেলুদা' আমার সবচেয়ে প্রিয়। অমর এ চরিত্রের স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। ফেলুদাকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় অনেকগুলো গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জয় বাবা ফেলুনাথ, কলকাতায় ফেলুদা, বাক্স রহস্য, সোনার কেল্লা, রয়েল বেঙ্গল রহস্য, শেয়াল রহস্য ইত্যাদি। গল্পগুলো যখন আমি পড়ি, তখন আমার মধ্যে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে আমি নিজেকে গল্পের চরিত্র হিসেবেও ভাবতে শুরু করি। ফেলুদার সঙ্গে থাকা তপেসের চরিত্র এ ক্ষেত্রে আমাকে খুবই আকর্ষণ করে। আর জটায়ুর চরিত্র আমাকে আনন্দ দেয়। তবে ফেলুদার চরিত্র এককথায় অসাধারণ। গল্পগুলো যখন আমি পড়ি, তখন সময় কোন দিক দিয়ে কেটে যায় আমার মনেই থাকে না। সব কাজ ভুলে গল্পগুলোর মধ্যে আমি নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। যতক্ষণ একটি গল্প পড়া শেষ না হয়, ততক্ষণ আমি বই ছেড়ে উঠতে পারি না। এক কল্পনার জগতের মধ্যে গল্পগুলো আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

আমার অন্যান্য বইয়ের সংগ্রহ : গোয়েন্দা গল্প ছাড়াও আমার সংগ্রহে মুক্তিযুদ্ধের বই, ইতিহাসের বই, সায়েন্স ফিকশন, গণিতের বই ও ম্যাজিক শেখার বই রয়েছে। গোয়েন্দা গল্প পড়ার পাশাপাশি এ বইগুলো পড়তেও আমার ভালো লাগে।

বই পড়ে আমার প্রাপ্তি : আনন্দ পাওয়ার জন্যই আমি মূলত বই পড়ি। তবে গোয়েন্দা গল্পগুলো আমাকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে সাহায্য করেছে। আমার চারপাশের অজানা জগৎ সম্পর্কে আমাকে ধারণা দিয়েছে বই। বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বই। বই পড়ে আমি মানুষের মন ও তার চিন্তা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পেয়েছি। ভবিষ্যতে এ জ্ঞান আমাকে পথ চলতে সাহায্য করবে। আমার পরিবার, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের কাছে আমাকে আদরণীয় করেছে বই।

উপসংহার : বই আমাকে সব সময় সৎ পথে চলতে সাহায্য করে। আমার মন খারাপ হলে বন্ধুর মতো আমার পাশে থেকে বই আমাকে সাহায্য করে। বই পড়ে আমি মানুষের জন্য ভালো কিছু করার প্রেরণা পাই। জ্ঞান ও বুদ্ধিতে মানুষকে শাণিত হতে হলে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেকেরই বই পড়া উচিত।

আমার চারপাশের প্রকৃতি

ভূমিকা : সবুজের চাদরে ঢাকা আমাদের এই দেশ। এ দেশের প্রাকৃতিক শোভা আমাদের মুগ্ধ করে। এ দেশের প্রকৃতির রূপ বড় বিচিত্র। এ দেশের নদী, মাঠ, অরণ্য, আকাশ, পাহাড় দেখে আমরা পুলকিত হই। আমাদের মাতৃভূমি তার অপরূপ ঐশ্বর্য ও সম্পদে অনন্য।

চারপাশের প্রকৃতি : আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা গ্রামের পরিবেশে। এখানকার মাঠ, ঘাট, বন ও প্রান্তর সবকিছুর সঙ্গেই আমার আত্মার সম্পর্ক। তাই এ প্রকৃতি আমার কাছে অন্য সব স্থানের চেয়ে অনেক বেশি আপন।

বন-বনানী : আমার চারদিকে সবুজের সমারোহ। যেদিকে তাকাই সেদিকেই ঘন সবুজ। আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, বট, শাল, সেগুন, মেহগনি, কড়ইসহ আরও কত গাছ। এসব গাছগাছালি মিলে চারপাশে একটা বনের মতো সৃষ্টি হয়েছে। কবি জসীমউদ্‌দীনের ভাষায় :

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,

ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরীর দেশ

বর্ষার দিনে যখন এ বনে বৃষ্টি আসে, তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন তার দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। আবার শীতের দিনে যখন গাছগুলোর পাতা ঝরে পড়ে, তখন প্রকৃতিকে অসহায় মনে হয়। বসন্তে নতুন পাতা এলে গাছগুলো নতুন সাজে সেজে ওঠে। শুধু বড় গাছগুলোই নয়, ছোট গাছগুলোও অপরূপ শোভা সৃষ্টি করে চারপাশে।

মাঠ-প্রান্তর : বনের দিক থেকে চোখ ঘোরাতেই ধানখেত সামনে এসে পড়ে। যখন তার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়, তখন মনে হয় সবুজের সমুদ্র বুঝি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাটক্ষেতের পাটগাছগুলোও বেশ বড় হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে। গমখেতের গমগুলো পেকে উঠেছে। তার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ছে, তখন সোনালি আলোয় চারদিক ভরে যাচ্ছে। এ মাঠেই শীতের সময় ফোটে সর্ষেফুল। তখন চারদিক হলুদ হয়ে ওঠে। মৌমাছির দল এসে তখন সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করে।

জলাশয় : মাঠ পার হয়ে রাস্তায় আসতেই একটা বড় পুকুর চোখে পড়ে। পুকুরের চারদিকে নারিকেল ও কলাগাছ লাগানো। পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। তার এক কোণে ফুটে আছে শাপলা ফুল। মাঝে মাঝে একটা দুটো মাছ লাফ দিচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে। দুটো ছেলে অনেক উঁচু একটা গাছের ডাল থেকে পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ঢেউ বয়ে গেল। পুকুরপাড় দিয়ে সামনে আসতেই একটা বিল চোখে পড়ে। বিলে অনেক পানি। জেলেরা সেখানে জাল দিয়ে মাছ ধরছে। বিলের পানিতে হালকা হালকা ঢেউ। তবে বর্ষায় এমন থাকে না। তখন অনেক বড় বড় ঢেউ এপার থেকে ওপার অবধি বয়ে যায়। বিলের ওপরে কিছু নৌকা ভেসে চলেছে। কিছু মানুষ বিলের এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে।

পশুপাখি : গাঙশালিক, বক, বেলে হাঁস, মাছরাঙা ছাড়াও বিলের ধারে রয়েছে আরও অনেক পাখি। রাতে মাঝে মাঝে দু-একটা মেছো বাঘ বিলের ধারে দেখা যায়। এ ছাড়া সবুজ ধানখেতে ও গাছের মাথায় ছুটে আসে টিয়া, চড়ুই, শালিক, ঘুঘু, বুলবুলি, ফিঙে, দোয়েলসহ আরও অনেক পাখি। ঘন সবুজ গাছের আড়ালে মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যায়। তবে সাপ, বেজি, বনবিড়াল সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

রাতের আকাশ : রাতের আকাশ দেখে মনে হয় এ যেন স্বর্গের লীলাভূমি। অগণিত তারা রাতের আকাশকে উজ্জ্বল করে তোলে। পূর্ণিমার সময় চাঁদের আলোয় ঝলমল করে চারপাশ। আবার অমাবস্যার রাতে চারদিকে কালো অন্ধকারে ভরে যায়। তখন জোনাকির আলোয় মানুষ পথ চিনে ঘরে ফেরে।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত : প্রকৃতি জেগে ওঠে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। কাকডাকা ভোরে মানুষ ঘুম থেকে উঠে আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সারা দিন পর আকাশ রাঙিয়ে যখন সূর্যাস্ত হয়, তখন প্রকৃতির কোলে যে যার স্থানে ফিরে যায়।

উপসংহার : আমার চারপাশের প্রকৃতি চোখ জুড়ানো ও মন ভুলানো। তাই যে একবার এ প্রকৃতির মাঝে আসে, সে আর এখান থেকে যেতে চায় না। খুঁজতে চায় না অন্য কোনো রূপ। কবি জীবনানন্দের ভাষায় :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর

এ দেশের প্রকৃতি ও এর সৌন্দর্য আমার গর্ব। আমি আমার দেশকে খুব ভালোবাসি।

আমার দেখা একটি মেলা

সূচনা : মেলা শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আক্ষরিকভাবে মেলা শব্দের অর্থ হলো 'মিলন'। মেলায় পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা হয় এবং ভাববিনিময় হয়। একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ ঘটে মেলায়। আমাদের সংস্কৃতিতে মেলার গুরুত্ব অসীম।

মেলার প্রচলন : অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মেলার প্রচলন ছিল। তবে তখন মেলার আয়োজন হতো সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে এবং বৃহৎ পরিসরে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব স্থানেই মেলা হয়। কোনো কোনোটির আয়োজন অনেক বড়, আবার কোনোটির ক্ষুদ্র। তবে মেলার আনন্দ এখন আগের মতোই রয়েছে।

মেলার উপলক্ষ্য: আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের ১০ই মহরমকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চৈত্রসংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমার দেখা মেলার উপলক্ষ্য ছিল পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ।

মেলার স্থান : সাধারণত খোলা কোনো বৃহৎ স্থানে, যেখানে মানুষের চলাচল রয়েছে, তেমন স্থানেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় স্কুলমাঠেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আমি যে মেলাটি দেখেছি, সেটি বসেছিল নদীর ধারের একটি বৃহৎ বটগাছের নিচে।

মেলার প্রস্তুতি : পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের দিন। এদিনকে উপলক্ষ্য করে মেলার প্রস্তুতিও ছিল বিশাল। অস্থায়ীভাবে বটগাছের চারদিকে দোকানপাট তৈরি করা হয়। একদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রাপালার জন্য একটি বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়। কিছু কিছু মানুষ মূল স্থানে জায়গা না পেয়ে রাস্তার পাশে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে বসার প্রস্তুতি নেয়। মঞ্চের চারদিকে মাইক লাগানো হয়।

মেলার চিত্র : পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মেলা শুরু হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেলার সূচনা করেন। মেলা শুরু হতেই এতে জনস্রোত দেখা যায়। যে দোকানগুলো কাল পর্যন্ত খালি ছিল তা আজ কানায় কানায় নানা দ্রব্যসামগ্রীতে ভরে যায়। মানুষ রঙিন পোশাক পরে মেলায় প্রবেশ করে। ছোট ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে আনন্দের ঝলক দেখা যায়। বৃদ্ধরাও ভিড় এড়িয়ে মেলায় প্রবেশ করতে থাকে। মেলার চারদিকে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করা যায়। প্রতিটি দোকানে মানুষ তাদের পছন্দের ও প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে শুরু করে। ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে মাটির খেলনা, বেলুন, বাঁশি আরও নানা জিনিসের দোকানে। নারীরা ভিড় করে প্রসাধনসামগ্রী ও চুড়ির দোকানে। এ ছাড়া কাপড়ের দোকানেও ভিড় লক্ষ করা যায়। পুরুষেরা তাদের পোশাকের দোকানের সামনে ভিড় করে। মেলার একদিকে মিষ্টির দোকান লক্ষ করা যায়। এখানে গরম জিলিপি কিনতে সবাই ভিড় করে। এ ছাড়া ছোলাভাজা, বাদামভাজা, পাঁপরভাজা, ভুট্টার খই, কনক ধানের খই, মুড়কি, বাতাসা, হাওয়াই মিঠাই ও নানা রকমের মিষ্টি পাওয়া যায় মেলায়। সবাই এগুলো খেতে খেতে মেলায় ঘুরে বেড়ায়। মেলার একদিকে একটি লোক সাপের খেলা দেখাচ্ছিল। তা দেখতে ভিড় করে অসংখ্য মানুষ। এ ছাড়া ছোটখাটো একটা সার্কাসের আয়োজনও ছিল।

মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যার সময় মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের গান পরিবেশনের পর শুরু হয় যাত্রাপালা। মঞ্চে ভেলুয়া সুন্দরীর পালা পরিবেশন করা হয়। যাত্রাপালায় ভেলুয়া সুন্দরীর জীবনের দুঃখ দেখে অনেকেই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষ মেলার ইতি টানে।

মেলার তাৎপর্য : মেলায় মানুষের সম্প্রীতির এক বন্ধন তৈরি হয়। স্থানীয়ভাবে তৈরি জিনিসের একটি প্রদর্শনী হয় মেলায়। মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে মেলায় এসে। শুধু তাই নয়, এখানে অর্থনৈতিক বিষয়ও যুক্ত থাকে। একদল মানুষের উপার্জনের মূল উৎস হলো মেলা। এ ছাড়া ক্রেতারাও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য মেলার ওপর নির্ভর করে। অনেকে মেলাকে ঘিরে বছরের বিকিকিনির বড় পরিকল্পনাও করে থাকে।

উপসংহার : বাঙালি সংস্কৃতির বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে মেলা। মেলা সাধারণ কোনো আয়োজন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের প্রথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মেলার মধ্য দিয়ে একশ্রেণির জীবন ও জীবিকা গড়ে উঠেছে। শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও মেলা আনন্দের উৎস। তাই তো মেলার দিনে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। মানুষকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে সমবেত করতে মেলার কোনো বিকল্প নেই। তাই তো মেলা আজও আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয়।

একটি দিনের দিনলিপি

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে একটি দিনের সূত্রপাত হয়। আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিনটি শেষও হয়ে যায়। একটি দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি অতীত হয়ে যায়। কিছু স্মৃতি কিছু ঘটনা প্রতিদিনই আমাদের মনে জমা হয়। আর এভাবেই পার হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবন।

আজ ২ জানুয়ারি। আমি সপ্তম শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছি। গত ২১ ডিসেম্বর আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল দিয়েছে। আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। বাড়ির সবাই বেশ খুশি হয়েছে। আজ সপ্তম শ্রেণিতে আমার প্রথম ক্লাস হলো। স্কুল একই কিন্তু ক্লাসরুম ভিন্ন। স্কুলের সবাইকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। সবার পরনে নতুন স্কুল ড্রেস। কাঁধে নতুন স্কুল ব্যাগ। আর ব্যাগভর্তি নতুন ক্লাসের বই।

স্কুলে আমার প্রথম ক্লাস ছিল বাংলা। জলিল স্যার সবার পরিচয় নিয়ে বাংলা পড়ালেন। ষষ্ঠ শ্রেণিতেও স্যার বাংলা পড়াতেন। স্যারের কণ্ঠ ও উচ্চারণ আমাকে মুগ্ধ করে। এরপর কাঁকন ম্যাডাম ক্লাস নিলেন। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়ালেন। তারপর গণিত ও ধর্ম ক্লাস হলো এবং টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। টিফিনে আমি রিংকুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। রিংকু আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বার্ষিক পরীক্ষায় আমার থেকে নম্বর কম পেলেও ও আমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও মেধাবী । ও আমার টিফিন থেকে কিছুটা ভাগও বসাল।

টিফিনের পর আমার বিজ্ঞান ক্লাস শুরু হলো। কালাম স্যার আমাদের অণুর গঠন পড়ালেন। বিজ্ঞানের জটিল জটিল বিষয়গুলো স্যার খুব সহজ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এ কারণে ক্লাসের সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। এরপর স্বপন স্যারের সমাজ ক্লাস শেষে আমাদের ছুটি হলো। রিকশায় চড়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়ি এসে দেখি মা আমার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। মা আমাকে স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং সবার খোঁজ-খবর নিলেন। এরপর আমি ছুটলাম মাঠের দিকে। সবার সঙ্গে ক্রিকেট খেললাম। আসার সময় সাগর ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলো। সাগর ভাইয়া খুব ভালো। যেকোনো বিপদে তাকে ডাকলেই পাওয়া যায়।

বাড়িতে এসে দেখি বাবা অফিস থেকে ফিরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বাজার থেকে আমার জন্য এনেছেন গরম গরম জিলাপি। মা বাবার পাশে আমাকে বসতে বললেন। আমি বাবার পাশে বসতেই তিনি আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। ভাইবোনদের মধ্যে তিনি আমাকে একটু বেশিই ভালোবাসেন। আমাকে সারা দিনের কথা জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বাবার সঙ্গে কথা শেষ করে আমি বাগানে গেলাম। অনেকগুলো গাঁদা আর ডালিয়া ফুলের চারা লাগিয়েছি বাগানে। সঙ্গে লাগিয়েছি দুটো গোলাপের চারা। একটা ডালিয়া গাছে কলি এসেছে। মনে হয়, লাল রঙের ফুল ফুটবে। গাঁদা গাছগুলোতেও কলি এসেছে। গোলাপগাছের গোড়ায় বেশ আগাছা জন্মেছে। আমি সব আগাছা পরিষ্কার করে সবগুলো গাছে পানি দিলাম।

সন্ধ্যার সময় হাতমুখ ধুয়ে আমি টেবিলে বসলাম। স্কুলব্যাগ থেকে এক এক করে সবগুলো বই নামালাম। হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলাম নতুন ক্লাসের বই। নতুন বইয়ে একধরনের গন্ধ থাকে। আমি প্রাণভরে সেই গন্ধ নিলাম। তারপর প্রতিটি বইয়ের প্রথম অধ্যায় উল্টে-পাল্টে দেখলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর আমি টেবিল থেকে উঠে টেলিভিশন দেখতে গেলাম।

টেলিভিশনে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছিল। খেলায় টান টান উত্তেজনা। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ভারত এক উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করল। খেলা শেষ হওয়ার পর বাবা সংবাদ শোনার জন্য চ্যানেল পরিবর্তন করলেন। বাবার সঙ্গে আমিও বসে বসে সংবাদ শুনলাম।

রাতে খাওয়ার জন্য সবাই একসঙ্গে টেবিলে বসলাম। খেতে খেতে বাবা অনেক মজার মজার গল্প করলেন। খাওয়া শেষ করে আমি ঘরে চলে এলাম। রাতে ঘুমানোর আগে আমি প্রতিদিনই বই পড়ি। আজ পড়লাম জুলভার্নের 'আশি দিনে বিশ্বভ্রমণ'। গল্পটা এত আকর্ষণীয় যে পড়া শেষ করতে ইচ্ছেই করছিল না। কিন্তু আমার তো আরেকটা কাজ বাকি। প্রতিদিনের সব কথা লিখে রাখা। এতক্ষণ পর্যন্ত যা লিখেছি, তা ছিল আমার আজকের সারা দিন। কাল আরও একটি নতুন দিন আসবে। ঘটবে আরও নতুন ঘটনা। আরও কিছু অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। সেগুলোও লেখা হবে আমার দিনপঞ্জির খাতায়।

শহিদ মিনার

ভূমিকা : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি

ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি'

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরির এ গান গেয়ে আমরা শহিদ মিনারে যাই। সেখানে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। শহিদ মিনার এদিন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত আপন। এ ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতেই বাংলার ছেলেরা রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থেই নির্মিত হয়েছে শহিদ মিনার।

শহিদ মিনার সৃষ্টির পটভূমি : ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'

এ ঘোষণার প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস, ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। সেখান থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হবে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শাষকগোষ্ঠী ২১ ফেব্রুয়ারিতে সকল প্রকার সভা, মিছিল, মিটিং ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্রজনতা এ বাধাকে অতিক্রম করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলটি আসতেই পুলিশ তার ওপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিউরসহ আরও অনেকে। তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থেই গড়ে ওঠে স্মৃতির শহিদ মিনার।

প্রথম শহিদ মিনার : ২১ ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রজনতা একটি শহিদ মিনার তৈরি করে। এ কাজে অংশ নেয় তিন শ ছাত্র ও দুজন রাজমিস্ত্রি। প্রথম শহিদ মিনার তৈরির জন্য সাঈদ হায়দার একটি নকশা প্রণয়ন করেন। তাঁর নকশায় শহিদ মিনারের উচ্চতা নয় ফুট থাকলেও তৈরির পর এটির উচ্চতা হয় এগারো ফুট। শহিদ শফিউরের পিতা ২৪ ফেব্রুয়ারি এটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। তবে বাঙালির হৃদয় থেকে তারা এ মিনারের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। কবি আলাউদ্দীন আল আজাদের ভাষায় :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক

একটি মিনার গড়েছি আমরা চার-কোটি পরিবার

আজকের শহিদ মিনার : বর্তমান শহিদ মিনারটির নকশা করেন স্থপতি হামিদুর রহমান। পরবর্তীকালে শহিদ মিনারটি আরও সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা যে শহিদ মিনারটি

দেখি সেটিই হামিদুর রহমানের চূড়ান্ত নকশার পরিপূর্ণ রূপ। প্রতিবছর মানুষ এ মিনারের সামনেই ভাষাশহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বর্তমানে এ শহিদ মিনারের আদলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

শহিদ মিনারের তাৎপর্য : শহিদ মিনারের স্তম্ভগুলো মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার তথা মা ও তাঁর শহিদ সন্তানের প্রতীক। মাঝখানের সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভটি মায়ের প্রতীক। চারপাশের ছোট চারটি স্তম্ভ সন্তানের প্রতীক, যারা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শুভ তার সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এটি শুধু একটি মিনার নয়, এটি আমাদের প্রেরণার প্রতীক। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, মুক্তিযুদ্ধেও শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। আমাদের যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রেরণা একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা যখনই অন্যায়ের শিকার হই, তখনি শহিদ মিনার তার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের প্রেরণা জোগায়।

শহিদ মিনার ও আমাদের সংস্কৃতি : আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশে যখনই কোনো অন্যায় সংঘটিত হয়, তখনই শহিদ মিনারের সামনে থেকে তার প্রতিবাদ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান হয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে। এমনকি কোনো জাতীয় বা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে রাখা হয়।

উপসংহার : শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণার উৎস। আমরা শহিদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের কথা ভাবি। আর বর্তমান প্রজন্মের কাছে গর্ব করে সে কথাগুলো বলি। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। ভাষার জন্য আমাদের আত্মদানের ইতিহাস ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। শহিদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

টেলিভিশন

ভূমিকা : গ্রিক শব্দ 'টেলি' ও লাতিন শব্দ 'ভিশন' থেকে টেলিভিশন শব্দটি এসেছে। টেলি শব্দটির অর্থ হলো দূরত্ব আর ভিশন অর্থ দেখা। টেলিভিশন মানুষের খুব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যেকোনো ঘটনা মুহূর্তেই আমাদের সামনে চলে আসে। বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন এখন অগ্রগণ্য। বর্তমান পৃথিবীতে টেলিভিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টেলিভিশনের আবিষ্কার : ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে প্রথম টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত টেলিভিশনকে আরও সংস্কার করে ব্রিটিশ ব্রড কাস্টিং ১৯৩৬ সালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিভিশনের প্রচার করে। টেলিভিশন নিয়ে এখনো চলছে নানা গবেষণা। পূর্বের মতো টেলিভিশন এখন আর চোখে পড়ে না। পূর্বে যে টেলিভিশন ওজনে ও আয়তনে বৃহৎ ছিল, এখন তা আর তেমন নেই। বিজ্ঞানের

দ্রুত অগ্রগতির ফলে এখন এলসিডি, এলইডি, থ্রিডি ইত্যাদি প্রযুক্তির টেলিভিশন বাজারে দেখা যায়। এগুলো প্রযুক্তিগতভাবে এত উন্নত যে, এতে ছবি দেখে জীবন্ত মনে হয়। তাছাড়া এগুলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী।

টেলিভিশনের ব্যবহার : পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়। মূলত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে টেলিভিশন চালু হয়েছে আজ থেকে প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে। বিনোদনের পাশাপাশি আমাদের দেশে টেলিভিশনে গণশিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার-পরিকল্পনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রচার করে থাকে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন : ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন তার যাত্রা শুরু করে। তবে ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় এবং তার পরে টাঙ্গাইলের তালিবাবাদে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। যার ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে প্রেরিত দৃশ্য আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখতে পাই।

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল : বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালু আছে। যেমন : এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, এনটিভি, বাংলাভিশন, একুশে টেলিভিশন, বৈশাখী টেলিভিশন, সময় টেলিভিশন, আরটিভি, মোহনা টেলিভিশন, মাছরাঙা টেলিভিশন, চ্যানেল ২৪, দেশটিভি, একাত্তর (৭১) টিভি ইত্যাদি।

আমাদের জীবনে টেলিভিশনের উপযোগিতা : বর্তমানে মানুষের জীবনে টেলিভিশন বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। মানুষ তার অবসর কাটায় টেলিভিশনের সামনে বসে। মনের ক্লান্তি দূর করে টেলিভিশন দেখে। একটি টেলিভিশন ঘরে থাকলে সারা দুনিয়ার ঘটনাকে হাতের মধ্যে পাওয়া যায়। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের সমস্ত খবর আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। জনকল্যাণ ও জনসচেতনতামূলক যেকোনো অনুষ্ঠান টেলিভিশনের মাধ্যমেই প্রচার করা হয়ে থাকে। শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলোও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। টকশোগুলোতে বিভিন্ন মতামত প্রচারিত হয়।

টেলিভিশনের নেতিবাচকতা : টেলিভিশন যেমন আমাদের আনন্দ দান করে, তেমনি এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। অধিক সময় টেলিভিশন দেখলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে। মাঝে মাঝে টেলিভিশনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরিপন্থি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এ অনুষ্ঠানগুলো তরুণ মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উপসংহার : বিজ্ঞান আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বিজ্ঞানের যুগে সবাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। দুনিয়ার সব খবর এখন মানুষের মুঠোর মধ্যে। টেলিভিশন এ কাজকে আরও সহজ করে দিয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে টেলিভিশন হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। তবে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু নীতিমালা থাকা উচিত, যা আমাদের কিশোর-তরুণদের সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে।

শৃঙ্খলাবোধ

সূচনা : 'Man is born free, but everywhere he is in chain'—মহান দার্শনিক রুশোর এ বক্তব্যের অর্থ হলো, মানুষ মুক্তভাবে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেও প্রতি পদেই সে শৃঙ্খলিত। এ পৃথিবীর সবকিছুই প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। প্রকৃতির নিয়মের সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটলেই মানবজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। নিয়ম মেনেই প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। আসে দিন আসে রাত।

শৃঙ্খলাবোধের স্বরূপ : শৃঙ্খলাবোধ বলতে সাধারণত জীবনযাপনে নিয়মনীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি অনুগত থাকাকে বোঝায়। সমাজজীবনে কোনো মানুষই আপন খেয়াল অনুযায়ী চলতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই তাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে জীবন পরিচালনাই হলো শৃঙ্খলাবোধ।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনের জন্য শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। শৃঙ্খলার কারণেই মানবজীবনে সুখ-শান্তি নেমে আসে। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কখনোই সুখী হতে পারে না। সে শুধু নিজেরই নয়, সমাজেরও শান্তি নষ্ট করে। শৃঙ্খলাহীন জীবন লক্ষ্যহীন নৌকার মতো পানিতে ভেসে বেড়ায়। তার কোনো ঠিকানা থাকে না। মানুষ যদি নিজের ভেতর শৃঙ্খলা ধারণ করতে না পারে, তবে সমাজেও নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। তাই সুখী জীবনযাপনের জন্য শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

শৃঙ্খলা চর্চার সময়: শৈশব হলো শৃঙ্খলা চর্চার উপযুক্ত সময়। নিয়ম মানেই শৃঙ্খলা। এটি রপ্ত করে চর্চার মাধ্যমে জীবনকে সুখী করা যায়। মানবজীবনে সফলতার চাবিকাঠি হলো শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার ফলেই মানুষ সমাজের আচরণবিধি মেনে চলে এবং সফলভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা : ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা বিশেষ গুরুত্ব পালন করে। কারণ এ সময়েই ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ রোপিত হয়। শৃঙ্খলাবোধ একজন ছাত্রকে দায়িত্বশীল করে তোলে। পড়াশোনার প্রতি তার মনোযোগ বৃদ্ধি করে। ভবিষ্যতে শৃঙ্খলাবোধই তাকে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে।

মানবজীবনে শৃঙ্খলা : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ উন্নত, কারণ সে নিয়মবদ্ধ জীবনযাপন করে। জীবনকে সার্থক করতে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ শুধু নিজের বা পরিবারের জন্য নয়, রাষ্ট্রের জন্যও সম্পদ। মানবজীবনে লক্ষ্যকে জয় করতে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

সমাজজীবনে শৃঙ্খলা : আদিম যুগ থেকেই মানুষের সমাজে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা হয়। বর্তমান যুগেও নিয়ম-শৃঙ্খলা সমাজের জন্য অপরিহার্য। সত্যিকার অর্থে নিয়ম-শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো সমাজ চলতে পারে না। নিয়মবদ্ধভাবেই সমাজের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। শৃঙ্খলাই সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলে। অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

শৃঙ্খলা সৃষ্টির উপায় : পরিবার শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র। একটি শিশু পরিবার থেকেই প্রথম শৃঙ্খলা শেখে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় বিদ্যালয়ে। শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর শৃঙ্খলাবোধকে ১০৫

জাগিয়ে তোলে। উত্তরোত্তর এ শৃঙ্খলাবোধের মধ্য দিয়েই শিশু একদিন উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শৃঙ্খলা মেনে না চললে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তার জীবনে নেমে আসে পরাজয়ের গ্লানি। খুব সমৃদ্ধ কোনো সমাজ বা প্রতিষ্ঠানও শৃঙ্খলার অভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অতএব শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বিশৃঙ্খলার পরিণতি : বিশৃঙ্খলার পরিণতি ভয়াবহ। বিশৃঙ্খলতা শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক যতই দক্ষ হোক না কেন, তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। একমুহূর্তের বিশৃঙ্খলা তাকে এবং তার সহযোগীদের মারাত্মক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। খেলার মাঠে কোনো খেলোয়াড় যদি বিশৃঙ্খল আচরণ করে, তবে তার দল নিশ্চিত অর্থে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। বিশৃঙ্খলা এভাবেই মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

উপসংহার : একজন মানুষ, একটি সমাজ, একটি জাতি তখনই সভ্য হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি সভ্যতা তথা জাতি তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা গিয়েছে। শৃঙ্খলাহীন মানুষের যেমন কোনো মর্যাদা নেই, তেমনি শৃঙ্খলাহীন জাতিরও কোনো সম্মান নেই। এ কারণেই সমাজজীবনে শৃঙ্খলা এত অত্যাবশ্যকীয়।

সুন্দরবন

ভূমিকা : সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের খুলনা জেলায় এবং বাকি ৩৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুন্দরবন অতুলনীয় এবং জীববৈচিত্র্যে অসাধারণ। সুন্দরবন একটি একক ইকো সিস্টেম। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছেও একটি আকর্ষণীয় স্থান।

সুন্দরবনের আয়তন ও অবস্থান : আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে সুন্দরবন ১৬,৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর আয়তন সংকুচিত হয়ে গেছে। বর্তমানে এ বনভূমির আয়তন ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার। সমস্ত সুন্দরবন দুটি বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্দরবনের ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা ও জলবায়ু : সুন্দরবনের ভূভাগ হিমালয় পর্বতের ভূমিক্ষয়জনিত জমা পলি থেকে সৃষ্টি। ভূ-বিজ্ঞানীরা এখানকার ভূমির গঠনবিন্যাসে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সামান্য ঢালের সন্ধান পেয়েছেন। কূপ খনন গবেষণা থেকে দেখা যায়, সুন্দরবনের পশ্চিম এলাকা তুলনামূলক স্থির। তবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটি অংশ ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের তুলনায় সুন্দরবনের মাটি একটু আলাদা

ধরনের। জোয়ার-ভাটার কারণে এখানকার পানিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বেশি। এখানকার মাটি পলিযুক্ত দোঁ-আশ।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ : সুন্দরবনের উদ্ভিদকুল বৈচিত্র্যময়। এখানকার অধিকাংশ গাছপালা ম্যানগ্রোভ ধরনের। এখানে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস, পরগাছা ইত্যাদি উদ্ভিদ। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডি.প্রেইন সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সন্ধানপ্রাপ্ত ৫০টি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরবনেই আছে ৩৫টি। সুন্দরবনের উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, ধুন্দল, বাইন প্রভৃতি। এ ছাড়া সুন্দরবনের প্রায় সবখানেই জন্মে গোলপাতা।

সুন্দরবনের প্রাণী : বিচিত্র সব প্রাণীর বাস সুন্দরবনে। এখানে রয়েছে বহু প্রজাতির স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী এবং শত শত প্রজাতির পাখি ও মাছ। সুন্দরবনের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। এ ছাড়া রয়েছে চিত্রা ও মায়া হরিণ, বানর, বনবিড়াল, লিওপার্ড, শজারু, উদ এবং বন্য শূকর। এখানে রয়েছে বিচিত্র সব পাখি। বক, সারস, হাড়গিলা, কাদাখোঁচা, লেনজা ও হট্টিটি এখানকার নদী-নালা ও গাছপালার মাঝে বসবাস করে। সমুদ্র উপকূলে দেখা যায় গাঙচিল, জল কবুতর, টার্ন ইত্যাদি। এ ছাড়া চিল, ঈগল, শকুন, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, পেঁচা, মধুপায়ী, বুলবুলি, শালিক, ফিঙে, ঘুঘু, বেনে বৌ, হাঁড়িচাঁচা, ফুলঝুরি, মুনিয়া, টুনটুনি, দোয়েল, বাবুই প্রভৃতি পাখি সুন্দরবনে বাস করে। সুন্দরবনের সরীসৃপদের মধ্যে রয়েছে কুমির, সাপ, টিকটিকি-জাতীয় সরীসৃপ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের অবস্থান : সুন্দরবনে প্রাপ্ত কাঠ জ্বালানি ও কাঠকয়লা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া ম্যানগ্রোভের ফল গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গোলপাতা শুকিয়ে ঘরের চাল ও বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে যে শামুক-ঝিনুক পাওয়া যায়, তা খাবার চুনের ভালো উৎস। সুন্দরবনের মধুর ওপর নির্ভর করে একশ্রেণির মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। দেশে বিক্রির পাশাপাশি এ মধু বিদেশেও রপ্তানি হয়। মৎস্যজীবীরা সুন্দরবন থেকে মাছ ধরে তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট ও হার্ডবোর্ড মিলস উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে সুন্দরবনের অবস্থা : সুন্দরবনের বনজ সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ অহরহ প্রবেশ করছে এখানে। ফলে এর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ম্যানগ্রোভও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শেষ আবাসস্থল সুন্দরবন। চোরা শিকারিদের হামলায় বাঘের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক আইলায় সুন্দরবন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

উপসংহার : সুন্দরবন আমাদের ঐতিহ্য। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করতে সুন্দর বনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। তাই আমাদের উচিত সুন্দরবন ও এর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে উদ্যোগী হওয়া।

অনুধাবন দক্ষতা

লিখিত কোনো বিষয় সাধারণভাবে আমরা অনেকেই পড়ে থাকি। কিন্তু সেই অংশটুকু পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পারাকে বলে অনুধাবন দক্ষতা। একটি পাঠে কিছু শব্দ থাকে, কিছু নতুন বিষয় থাকতে পারে, যার অর্থ বা ধারণা জানা না থাকলে পাঠটির পূর্ণ ধারণা লাভ সহজ হয় না। তাই একটি পাঠ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে পাঠসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ও জানতে, বুঝতে হয়। আবার তা কেবল মুখস্থ করলে সেটি বেশি দিন মনে না-ও থাকতে পারে। সেই জানা জ্ঞান অন্য কোনো পাঠের সাথে বা জ্ঞানের সাথে মেলাতে পারার ক্ষমতাও থাকতে হয়। এভাবেই অনুধাবন দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়। অনুধাবন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হয়। অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এর জন্য নম্বর বরাদ্দ থাকে ১x৫=৫।

অনুধাবন পরীক্ষা :

পৃথিবী, নির্ঝর, অর্ক, মৃত্তিকা, শ্রাবণী, সৃষ্টি ও অত্রি শীতের ছুটিতে চরকাবায় বেড়াতে গিয়েছে। ওরা ভাই-বোন মিলে এলাকাটির সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখল। ওখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়,একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একটি বাজার আছে। এলাকার অধিকাংশ জনগণই শিক্ষিত। কৃষিজীবী, চাকরিজীবী,ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ সেখানে বসবাস করেন।বেশ কিছু লোক জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপসহ নানা দেশে চাকরি নিয়ে গেছেন। এলাকার জনগণ মোটামুটি সচ্ছল। বৈদেশিক অর্থ লেনদেনের জন্য ওখানে বেশ কিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে ফুলের বাগানও রয়েছে। চরকাবা এলাকাটি বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রামীণ এলাকা।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. জীবিকা শব্দের অর্থ কী?

খ. কৃষিজীবী কারা?

গ. সচ্ছল পরিবার বলতে কী বুঝায়?

ঘ. চরকাবায় কেন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়?

ঙ. আদর্শ গ্রাম বলতে কেমন গ্রামকে বুঝায়?

সারাংশ/সারমর্ম

কোনো পদ্য বা গদ্যের মূলভাব বা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার নামই সারমর্ম বা সারাংশ। সাধারণত পদ্যের ভাব সংক্ষেপে প্রকাশকে সারমর্ম এবং গদ্যের বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে সারাংশ বলে। সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময় :

১. যে পাঠটুকুর সারমর্ম বা সারাংশ রচনা করতে হবে, সেটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।

২. বাড়তি বিষয় বর্জন করতে হবে। কখনো কোনো পাঠের মূল ভাব উপমা রূপকের আড়ালে থাকতে পারে, তা বুঝে মূল ভাব লিখতে হবে।

৩. সারাংশ বা সারমর্মে উপমা, রূপক — এসব বাদ দিয়ে লিখতে হবে।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তি বর্জন করে পরোক্ষ উক্তিতে লিখতে হবে।

৫. আমি, আমরা বা তুমি, তোমরা দিয়ে বাক্য শুরু করা যাবে না।

৬. মূল অংশে উদ্ধৃতি থাকলে প্রয়োজনে সেই উদ্ধৃতির ভাবটুকু উদ্ধৃতি ছাড়া লিখতে হবে।

এক.

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ-যুগান্তর– অনন্ত মহান,
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
–এ ধরায় স্বর্গ সুখ নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম : পৃথিবীর কোনো কিছুই সামান্য নয়। ছোট ছোট বালুকণা যেমন মহাদেশ তৈরি করে, তেমনি বিন্দু বিন্দু জল মহাসাগরের জন্ম দেয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় যুগ-যুগান্তরের। সামান্য অপরাধের পথ ধরেই আসে মহাপাপ। সামান্য একটু করুণার ও স্নেহের বাণী এ পৃথিবীতে স্বর্গসুখ এনে দিতে পারে। তাই ছোট হলেই কোনো কিছু তুচ্ছ নয়।

দুই.

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক– মানুষেতে সুরাসুর–
রিপুর তাড়নে যখন মোদের বিবেক পায়গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

সারমর্ম : স্বর্গ বা নরক দূরে কোথাও নয়। স্বর্গ ও নরক মানুষের মাঝেই বিরাজ করে। মানুষ যখন কোনো খারাপ কাজ করে অনুতপ্ত হয়ে যন্ত্রণায় ভোগে, তখন সেটাই নরকযন্ত্রণা। পরস্পরের প্রতি বিভেদ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ এই পৃথিবী নরকে পরিণত করে। যখন একে অন্যকে সব বৈরিতা ভুলে বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসে, তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে স্বর্গীয় সুখ।

তিন.

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সেই পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইলো যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

সারমর্ম : পৃথিবীর যত উন্নতি সবই শ্রমজীবী মানুষের দান। তাদের নিরলস সেবা ও শ্রমের কারণেই আমরা সুখী জীবন যাপন করি। তাদের এই শ্রমের মূল্য আমরা দেই না, তাদের দুঃখ-বেদনা অনুভব করতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে তারাই সভ্যতার অগ্রযাত্রার কারিগর। তাই পরিশ্রমী মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের জয়গান করা আমাদের কর্তব্য।

চার.

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা –
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।।

সারমর্ম : কবি সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না। কবি কামনা করেন, তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যেন তিনি যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। বিপদ হতে রক্ষা, দুঃখে সান্ত্বনা, কর্মের ভার লাঘব তাঁর প্রত্যাশিত নয়। কবির কামনা বিপদকে, দুঃখকে, ভয়কে জয় করার মনোবল যেন তাঁর অটুট থাকে।

পাঁচ.

সময় ও স্রোত কাহারও অপেক্ষায় বসে থাকে না, চিরকাল চলিতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, ইহাকে ভয় দেখাও ভ্রুক্ষেপও করিবে না, সময় চলিয়া যাইবে, আর ফিরিবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না গত সময় আর ফিরিয়া আসিবে না।

সারাংশ : সময় চিরবহমান। শত চেষ্টা করলেও সময়ের গতিকে কেউ রুদ্ধ করতে পারে না। চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে হয়তো লুপ্ত-স্বাস্থ্য বা ধ্বংস হওয়া ধন-সম্পদ পুনরায় উদ্ধার করা যায়। কিন্তু চলে যাওয়া সময়কে শত চেষ্টায়ও কখনোই ফিরিয়ে আনা যায় না।

ছয়.

অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু করুণ চাহনি নিক্ষেপ করো, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মানবতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন, পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

সারাংশ : মানুষের জন্য অনেক বড় কিছু করতে না পারলেও ছোট ছোট কাজের দ্বারাও আমরা মানুষের উপকারে আসতে পারি। সাধ্যমতো সহায়তা দিয়ে অন্যের মনে আশার সঞ্চার করতে পারি। মানবিক আচরণ দিয়ে অসহায় মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারি। এভাবেই মহৎ মানুষ তাঁদের মহত্ত্বের পরিচয় দেন।

সাত.

অভাব আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীব সৃষ্টি বৃথা হইতো। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এতো উদ্যম, এতো উদ্যোগ। আমাদের সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়াই কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থাণু, স্থবির হইতে হইতো, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইতো। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই তো আমরা সেবার সুযোগ পাইয়াছি। সেবা মানবজীবনের ধর্ম। দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্রতত্র সদাকাল ছড়াইয়া রহিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্রে অজস্র দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রু মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

সারাংশ : অভাব বা প্রয়োজনের কারণেই মানুষ সৃষ্টি করে। সৃষ্টির প্রেরণাই মানুষের কাজের উৎস। অভাব না থাকলে মানুষ অলস হয়ে যেত। দুঃখ আছে বলেই মহামানবগণ সেবার হাত প্রসারিত করেন। দুঃখে যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি মানবের পরম বন্ধু। দুঃখের আগুনে পুড়েই মানুষ খাঁটি সোনা হয়। তাই দুঃখকে শত্রু ভাবা ঠিক নয়।

ভাবসম্প্রসারণ

আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় কখনো কোনো একটি বাক্যে বা কবিতার এক বা একাধিক চরণে গভীর কোনো ভাব নিহিত থাকে। সেই ভাবকে বিস্তারিতভাবে লেখা, বিশ্লেষণ করাকে ভাবসম্প্রসারণ বলে। যে ভাবটি কবিতার চরণে বা বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। সাধারণত সমাজ বা মানবজীবনের মহৎ কোনো আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতা, প্রেরণামূলক কোনো বিষয় যে পাঠে বা বাক্যে বা চরণে থাকে, তার ভাবসম্প্রসারণ করা হয়। ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রূপকের আড়ালে বা প্রতীকের ভেতর দিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তাকে যুক্তি, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদির সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে হয়।

ভাবসম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে যেসব দিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে :

এক. উদ্ধৃত অংশটুকু মনোযোগসহ পড়তে হবে।

দুই. অন্তর্নিহিত ভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

তিন. অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনো উপমা-রূপকের আশ্রয়ে নিহিত আছে কি না, তা চিন্তা করতে হবে।

চার. সহজ-সরলভাবে মূল ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

পাঁচ. মূল বক্তব্যকে প্রকাশরূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে।

ছয়. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এক.

পিতামাতা গুরুজনে দেবতুল্য জানি,
যতনে মানিয়া চল তাহাদের বাণী।

মূলভাব : বাবা, মা ও অভিভাবকবৃন্দ আমাদের জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য যেসব উপদেশ দেন, সেগুলো মেনে চলা কর্তব্য।

সম্প্রসারিত ভাব :

পিতা-মাতা আমাদের জীবন দান করেন এবং অনেক কষ্ট করে লালন-পালন করেন। পিতা-মাতার সঙ্গে অন্য গুরুজনরাও আমাদের সুস্থ জীবন বিকাশে সহায়তা করেন এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমাদের বড় করে তোলেন। এঁরা সবাই বয়সে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায় আমাদের থেকে অনেক বড়। তাঁরা আমাদের স্নেহ করেন, ভালোবাসেন এবং সর্বদাই মঙ্গল কামনা করেন। অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা জানেন কী করলে আমাদের ভালো হবে। নবীনতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে এই কঠিন ও জটিল পৃথিবীর অনেক কিছুই আমাদের অজানা। সে জন্য পিতা-মাতা, গুরুজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ চলার পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা না করতে পারলে জীবনে সফলতা আসবে না। প্রতি মুহূর্তে আমরা হোঁচট খাব। আমরা জানি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বায়েজিদ বোস্তামি কীভাবে গুরুজনদের আদেশ-উপদেশ পালন করেছেন। আর সে কারণেই তাঁরা আজ সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতে পেরেছেন। তাই পিতা-মাতা, গুরুজন আদর্শস্থানীয়, দেবতুল্য এবং আরাধনাযোগ্য। তাঁদের বাণী অনুসরণ করে নিজের জীবন গড়তে হবে এবং দেশ, জাতি তথা সমগ্র বিশ্বকে শাশ্বত কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত : পিতা-মাতা, গুরুজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ মানলে নিজের জীবন সুন্দর ও বিকশিত হবে এবং দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে।

দুই.

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

মূলভাব : কাজই মানুষের পরিচয়কে ধারণ করে। মুখে বড় বড় কথা না বলে কাজ করলে সভ্যতার বিকাশ সাধন হবে।

সম্প্রসারিত ভাব : আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা অনেক কথা বলতে ভালোবাসে কিন্তু কাজের সময় তারা ফাঁকি দেয়। উপরন্তু কাজ শেষে তারা অন্যের সমালোচনা করে। এসব মানুষ সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তারা সভ্যতার বিকাশে কোনো ভূমিকা রাখে না বরং এর অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু নিজে কাজ করলে এবং অন্যের কাজে সহায়তা করলে আমাদের দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। বিশ্বের

সব দেশেই শ্রমকে, কর্মকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। মহামানবদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়,তাঁরা কর্ম ও নিষ্ঠা দিয়ে পৃথিবীতে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রেখেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরা সারা বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এখন থেকে চার দশকেরও অধিক সময় আগে নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন অলড্রিন—এই তিনজন মানুষ ঐকান্তিক সাধনা, নিরলস শ্রম ও কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে চাঁদে অবতরণ করতে পেরেছিলেন। এই দুঃসাহসী কাজের জন্য তাঁরা আজও মানুষের কাছে বরণীয় হয়ে আছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদেরও উচিত তাঁদের পথকে অনুসরণ করে ভালো ও পুণ্যকর্ম করে নিজের, পরিবারের তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। আর যারা কাজ না করে বেশি কথা বলে, তাদের মানুষ বাচাল বলে। আর বাচালের সঙ্গ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

সিদ্ধান্ত : আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করে কাজ ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

তিন.

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

মূলভাব : মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারে এবং এই ভাষায়ই তাদের প্রাণের স্ফূর্তি ঘটে।

সম্প্রসারিত ভাব : পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই নিজস্ব ভাষা আছে এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষা আলাদা। আমরা ভাষার মাধ্যমে শুধু নিজের মনের ভাবই অন্যের কাছে প্রকাশ করি না, মাতৃভাষার সাহায্যে অন্যের মনের কথা, সাহিত্য-শিল্পের বক্তব্যও নিজের মধ্যে অনুভব করি। নিজের ভাষায় কিছু বোঝা যত সহজ, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। বিদেশে গেলে নিজের ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় আরও প্রখরভাবে। তখন নিজের ভাষাভাষী মানুষের জন্য ভেতরে ভেতরে মরুভূমির মতো তৃষিত হয়ে থাকে মানুষ। আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, পড়ালেখা করি, গান গাই, ছবি আঁকি, সাহিত্য রচনা করি, হাসি-খেলি, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করি। অন্য ভাষায় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের শুরুতে অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করে পরে আক্ষেপ করেছেন এবং মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। মায়ের মুখের বুলি থেকে শিশু তার নিজের ভাষা আয়ত্ত করা শুরু করে এবং এই ভাষাতেই তার স্বপ্নগুলো রূপ দেবার চেষ্টা করে, এই ভাষাতেই লেখাপড়া করে এবং জগৎ ও জীবনকে চিনতে শুরু করে। ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে আন্তসম্পর্কের জন্য, দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখার জন্য আমাদের অন্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু মাতৃভাষার বুনিয়াদ শক্ত না হলে অন্য ভাষা শেখাও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে।

২০২৫

সিদ্ধান্ত : স্বদেশের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে, এর বিকাশ ও সমৃদ্ধিকে অবাধ করতে হবে এবং বিকৃতিকে রোধ করতে হবে। সুপেয় জল যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি স্বদেশের ভাষা সুমিষ্ট।

চার.

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড

মূলভাব : লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের আধার। একটি জাতির রুচির পরিশুদ্ধ জ্ঞানের গভীরতা ও সভ্যতার অগ্রগমন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ঐ জাতির লাইব্রেরির মাধ্যমে।

সম্প্রসারিত ভাব : একটি জাতি বা দেশের সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলাধুলা-বিনোদন, সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়কে ধারণ করে সেই জাতির সযত্নে তৈরি লাইব্রেরি। কখনো কখনো মানুষের মুখ যেমন ব্যক্তির অন্তর্গত রূপ বা পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে, তেমনি লাইব্রেরি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। লাইব্রেরি জাতির অতীত ও বর্তমানকে এক সুতায় বেঁধে রাখে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। জ্ঞানান্বেষী ও সত্যসন্ধানী মানুষ লাইব্রেরিতে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং জাতির সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে ভূমিকা রাখে। একটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত সাহিত্যগ্রন্থ দেখে সংশ্লিষ্ট জাতির সাহিত্যরুচি উপলব্ধি করা যায়, বিজ্ঞানগ্রন্থ দেখে জাতির বিজ্ঞান-চিন্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুভব করা যায়। তাই গ্রন্থাগার হচ্ছে কালের সাক্ষী। জ্ঞান-বিজ্ঞানসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরি পরম বন্ধু এবং অনন্ত উৎস। পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির পেছনে রয়েছে লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই অনেক বড় বড় যুদ্ধের পরে দেখা গেছে বিজয়ী শক্তি পরাজিত জাতির লাইব্রেরিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একটি বৃহৎ লাইব্রেরি জাতির সব ধরনের তথ্যই শুধু সংরক্ষণ করে না, দেশের সঠিক উন্নতিতেও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরি মানুষের আনন্দেরও খোরাক জোগায় এবং মানুষের মনকে প্রশান্ত করে। পুস্তকপাঠ মানুষের একটি সৃষ্টিশীল শখ। আর এই শখ পূরণের জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

সিদ্ধান্ত : যে জাতি যত উন্নত, সেই দেশের লাইব্রেরি তত সমৃদ্ধ।

পাঁচ.

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

মূলভাব : অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই মানুষ্যজীবনের সার্থকতা।

সম্প্রসারিত ভাব : ফুল এই জগতের একটি অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি। তার সৌন্দর্য দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়। ফুলের গন্ধে মানুষের মন ভরে ওঠে। ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে, ফুল থেকে তৈরি হয় ফল। সেই ফল মানুষ, পশু-পাখি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে এবং দেহ ও মনের বিকাশের জন্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। ফুল-ফল থেকে তৈরি হয় জীবন রক্ষাকারী অনেক ওষুধ। ফুলের প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সৌরভ। ফুল প্রিয়জনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপহার। যেকোনো আনন্দ-উৎসবকে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করতে ফুলের কোনো বিকল্প নেই। অন্যের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার ও উপকারের মধ্যেই ফুলের পরিতৃপ্তি। রূপ-ঘ্রাণ-লাবণ্য সবই অপরের জন্য বিলিয়ে দিয়ে ফুল ধন্য হয়। মানবসমাজেও এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা

অন্যের কল্যাণে নিজের সমস্ত অর্জন উৎসর্গ করেন। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। সমাজসেবা করে নিজের জীবন তুচ্ছ করে সমাজকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। পরার্থপরতা একটি মহৎ গুণ। পরের উপকারে নিজেকে বিসর্জন দিলে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব করা যায় এবং নিজের দুঃখ-বেদনাও ভুলে থাকা যায়। স্বার্থচিন্তা মানুষকে সুখ দিতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে বিব্রত করে তোলে।

সিদ্ধান্ত : পুষ্পকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে মানবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করলে অনির্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব।

ছয়.

ইটের পর ইট মধ্যে মানুষ কীট

মূলভাব : নগরসভ্যতার পীড়নে মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শহরের কৃত্রিমতায় মানুষ ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে আজ কীটে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রসারিত ভাব : নদী-নালা-খাল-বিল-পাহাড়-অরণ্য প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান। কিন্তু মানুষ সব সময়ই আধিপত্যবাদী। সে প্রকৃতির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইটের পরে ইট গেঁথে একটার পর একটা দালান তৈরি করে নগর সৃষ্টি করেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে প্রকৃতির প্রত্যাশিত বিকাশ। হারিয়ে যাচ্ছে ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়, সুমিষ্ট বায়ুপ্রবাহ, নদীর কলধ্বনি। সেই মমতাময় ও স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে দখল করে নিয়েছে এখন বড় বড় অট্টালিকা, বায়ু ও শব্দদূষণ, তীব্র যানজট ও কোলাহল। মানুষ এখানে স্বাভাবিকভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে পারে না। শহরে গ্রামের সেই মিলনোন্মুখ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নেই, তার বিপরীতে আছে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এখানে কেউ কারো সুখ-দুঃখের অংশীদার হয় না। প্রত্যেকেই এখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসবাস করে। ফলে আরণ্যক ভূমিকে ধ্বংস করে মানুষ যতই যন্ত্রসভ্যতার বড়াই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ নগরসভ্যতার যাঁতাকলে পড়ে ভেতরে-বাইরে নিঃস্ব হয়ে কীটে পরিণত হচ্ছে। জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরে উঠেও মানুষ আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রকৃতি ধ্বংস করার কারণে মানুষ এখন প্রতিমুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে শঙ্কিত থাকে। সে আজ মুক্ত পরিবেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত। সে একটু নির্মল বাতাস সেবন করতে চায়, বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে চায়, প্রাণখুলে কথা বলতে চায়, সহমর্মী হতে চায় একে অন্যের। তাই আবার সে ফিরে পেতে চায় সেই প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম।

সিদ্ধান্ত : নগর মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে কিছুটা সহজ করলেও তার স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। নগর মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

সাত.

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

মূলভাব : প্রকৃতির সবকিছুরই একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে এবং সেই সৌন্দর্য যথোপযুক্ত পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্ত ও আকর্ষণীয়।

সম্প্রসারিত ভাব : সৌন্দর্য প্রকৃতির এক মহামূল্যবান দান। কোথায় সেই সৌন্দর্য সবচেয়ে নান্দনিক তা প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয়। নির্দিষ্ট পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটলে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বন্য প্রাণীরা বনেই সুন্দর, পাখি মুক্ত আকাশে। ফুল সুন্দর গাছে, মাছ স্বাভাবিক জলে। কিন্তু বন্য প্রাণীকে লোকালয়ে, পাখিকে খাঁচায়, ফুলকে ফুলদানিতে, মাছকে ডাঙায় রাখলে তাদের জীবনের গতি ব্যাহত হয়, সৌন্দর্যের হানি ঘটে, কখনো কখনো জীবননাশের আশঙ্কা তৈরি হয়। এরা প্রত্যাশিত পরিমণ্ডল হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে। শিশুরও যথার্থ স্থান মায়ের কোল। মায়ের কোলে শিশুকে যতটুকু মানায়, অন্য কোথাও তা সম্ভব নয়। নিজেদের শখ-আহ্লাদ পূরণের জন্য মানুষ কখনো কখনো কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বন্য প্রাণী, পাখি, মাছ পোষার চেষ্টা করে, কিছুটা হয়তো সফলও হয়। কিন্তু সেই সব প্রাণীর জীবনের ছন্দ নষ্ট হয়, ব্যাহত হয় যথার্থ বিকাশ। তাই কৃত্রিমতা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু প্রাণীর আবাস নয়, মানুষের জীবনেও কৃত্রিমতা কাম্য নয়। কখনো কখনো মানুষ মুখোশ পরে তার যথার্থ রূপকে ঢেকে কৃত্রিম আচরণ করে। ময়ূরের পেখম লাগালেই কাক কখনো ময়ূর হয় না।

সিদ্ধান্ত : যার যেখানে স্থান, তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। প্রকৃত রূপেই সবকিছু সুন্দর, কৃত্রিমতা স্বতঃস্ফূর্ততার অন্তরায়।

আট.

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মূলভাব : মানুষে মানুষে অনেক ধরনের বিভেদ-বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে আমরা সবাই মানুষ।

সম্প্রসারিত ভাব : সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর একই জল-হাওয়ায় আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের সবার রক্তের রং লাল। তাই মানুষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভৌগোলিকভাবে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অথবা আমরা যে যুগেরই মানুষ হই না কেন, আমাদের একটি পরিচয় আমরা মানুষ। কখনো কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা জাত-কুল-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য তৈরি করে মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, এক দল আরেক দলকে ঘৃণা করি, পশ্চাতে ফেলতে চাই, পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হই। কিন্তু এগুলো আসলে সাময়িক। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা একে অন্যের পরম সুহৃদ। আমাদের উচিত সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া এবং তার অধিকার সংরক্ষণে একনিষ্ঠ থাকা। মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আশরাফ-আতরাফ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, কেন্দ্রবাসী-প্রান্তবাসী এমন ভাগাভাগি কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাতে মানবতার অবমাননা করা হয়। তাই আধুনিক কালে এক বিশ্ব, এক জাতি চেতনার বিকাশ ঘটছে দ্রুত। মানব জাতির একই একাত্ম-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে আসবে। মানুষ সংঘাত-বিদ্বেষমুক্ত শান্তিপূর্ণ এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সর্বত্র মনুষ্যত্বের জয়গাথা ঘোষিত হবে।

সিদ্ধান্ত : সব ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বে প্রার্থিত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবেদনপত্র ও চিঠি

এক. জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন।

তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২২

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
কার্তিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
মাধ্যম : শ্রেণিশিক্ষক।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আমি সাধারণত প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখেই আমার বেতন পরিশোধ করে থাকি। কিন্তু এ মাসে বাবা টাকা পাঠাতে দেরি করায় নির্দিষ্ট দিনে বেতন পরিশোধ করতে পারিনি, যে কারণে আমার জরিমানা হয়েছে। আমি আজ বেতন পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু আমার পক্ষে জরিমানা দেওয়া কষ্টকর।

অতএব, বিনীত আবেদন এই যে, সহৃদয় বিবেচনার মাধ্যমে জরিমানা মওকুফ করে আমার বেতন পরিশোধ করার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

ফয়সাল আহমেদ সুমন

শ্রেণি : সপ্তম

রোল নম্বর : ৯

দুই. স্কুলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন।

তারিখ : ৩রা আগস্ট ২০২২

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

জামালপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

জামালপুর।

বিষয় : সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের স্কুলের টিউবওয়েলটি আর্সেনিকমুক্ত না হওয়ায় আমরা খাওয়ার পানির বিশেষ সংকটে আছি। এ অবস্থায় আমাদের স্কুলে দ্রুত একটি আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা দরকার।

অতএব, জনাবের নিকট বিনীত আবেদন, জরুরি ভিত্তিতে একটি আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক

জামালপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে

অনিন্দ্য সোম

শ্রেণি : ৭ম

রোল : ০৫

তিন. তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখো।

তারিখ : ২রা জুন ২০২২

বরাবর

উপজেলা চেয়ারম্যান

গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ

রাজশাহী।

বিষয় : গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ জনসংখ্যা প্রায় দুই হাজারের ওপরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এখানে কোনো পাঠাগার নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানচর্চা, মানসগঠন ও সৃজনশীল চেতনা বিকাশে একটি পাঠাগার খুবই প্রয়োজন। এ ছাড়া এলাকায় দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে একটি পাঠাগার হলে তরুণরাও তাদের অলস সময়কে জ্ঞানচর্চার মতো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে পারবে।

অতএব, গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় সব বয়সের জনসাধারণের উপকারের কথা বিবেচনা করে অতিসত্বর এখানে একটি পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ার জনসাধারণের পক্ষে

রোদেলা শারমিন

চার. তোমার ছাত্রাবাস জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার মাকে পত্র লেখ।

শাহজাদপুর

সিরাজগঞ্জ

১৪ই জুন ২০২২

পূজনীয় মা

আমার প্রণাম নিও। বাবাকে আমার প্রণাম দিও। তুমি ও বাবা কেমন আছ? তোমাদের জন্য আমার সব সময়ই চিন্তা হয়। নিজেদের শরীরের প্রতি যত্ন নিও। আমি এক সপ্তাহ আগে আমার স্কুলের ছাত্রীনিবাসে উঠেছি। ছাত্রীনিবাসের পরিবেশ খুবই ভালো। বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রীরা এখানে থাকে। ছাত্রীরা পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। যে কারণে কারো কোনো সমস্যা হয় না। অবসর সময়ে অনেকে একসাথে গল্প করি। আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যায় যেমন সবাই একত্রে আড্ডা দিই, অনেকটা সেই রকম। ছাত্রীনিবাসের মধ্যেই একটি ছোট পাঠাগার আছে। এখানে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের বই আছে। ওখানে বসে বই পড়া যায় আবার তিন দিনের জন্য কক্ষেও নিয়ে আসা যায়। আমার কক্ষে যে মেয়েটি আছে, সেও ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। ওর নাম মণি। ও খুলনার মেয়ে। মণি খুবই সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত গায়। তোমাদের জন্য মন খারাপ হলে মণি আমাকে গান শোনায়। আমার কক্ষটা চারতলায়। কক্ষের জানালায় দাঁড়ালে সবুজ গাছের উপর দিয়ে সুন্দর আকাশ দেখা যায়। ছাত্রীনিবাসে একটি মিলনায়তন আছে, সেখানে ক্যারম ও টেবিল টেনিস খেলা যায়, শীতের সময় ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম প্রথম ছাত্রীনিবাসের খাবার খুব ভালো লাগত না, তখন তোমার রান্নার কথা খুব মনে হতো। কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রতি মাসে দু বার বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে অনেকটা উৎসবের মতো। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। আশা করি আমি ভালোই থাকব।

স্বচ্ছ কেমন আছে? ওর লেখাপড়ার প্রতি নজর রেখো। পূজার ছুটি হলেই আমি বাড়ি চলে আসব। আমার জন্য আশীর্বাদ করো।

ইতি

তোমাদের আদরের

শুভ্রা গোস্বামী

	ডাকটিকিট
প্রেরক	**প্রাপক**
শুভ্রা গোস্বামী	**রেখা গোস্বামী**
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	**কলেজ রোড, সিরাজগঞ্জ**

পাঁচ.তোমার জীবনের লক্ষ্য কী জানিয়ে বড় ভাইকে চিঠি লেখ।

দোহার, ঢাকা

১৩ ই জানুয়ারি ২০২২

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই,

আমার সালাম নেবেন। বাড়ির সকলে আমরা ভালো আছি। আমার স্কুলের ক্লাস ভালোভাবে শুরু হয়েছে। আমিও পড়াশোনা শুরু করেছি। আদরের ছোট বোন অত্রিকে ভর্তি করানো হয়েছে। আপনার কথামতো আমরা দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে যাই। আপনি চিন্তা করবেন না।

আপনি জানতে চেয়েছিলেন আমি বড় হয়ে কী হতে চাই। আমাদের জলীল স্যারকে তো আপনি চেনেন। আমি স্যারকে খুব পছন্দ করি। স্যার আমাদের খুব ভালোভাবে পড়ান। পড়ানোর সময় আমরা কীভাবে বড় হতে পারব, দেশের মানুষের সেবা করতে পারব, পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে পারব--এসব বলেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের জন্য এখনো আদর্শ শিক্ষক অনেক বেশি দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি, ভালোভাবে পড়ালেখা শেষ করে আমি শিক্ষক হব।

আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমাদের এলাকার সবাই ভালো আছেন। দাদা-দাদি এখন বেশ সুস্থ। আপনি বাড়ি আসার সময় আমার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা নিয়ে আসবেন। ভালো থাকবেন।

ইতি

আপনার আদরের

সুমন রহমান অর্ক

প্রেরক:	প্রাপক
সুমন রহমান অর্ক	মোয়াজ্জেম হোসেন নীলু
মিঞাবাড়ি, চরকাবা	১৯/৫০ রূপনগর
দোহার, ঢাকা ১৩৩১	পল্লবী, ঢাকা ১২১৬
	ডাকটিকিট

ছয়. তোমার এলাকার একটি লোকজ উৎসবের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে পত্র লিখ।

প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া

রাজানগর, চট্টগ্রাম

তারিখ : ৮ই মে ২০২২

প্রিয় পুতুল,

আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নাও। আজ প্রায় দুই বছর হতে চলল তুমি রাশিয়া চলে গেছ। আমাদের দুজনের জীবন যে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল, তা কিছুতেই ভুলতে পারি না। তুমি তোমার বাবা-মার সঙ্গে রাশিয়া চলে যাওয়ার পর এখনো আমাদের এলাকার নানা অনুষ্ঠান সেই আগের মতোই আমরা উপভোগ করি। তবে আমরা তোমার অভাব বোধ করি। এবার আমাদের এলাকায় বেশ বড় আয়োজনে বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ আমি সেই উৎসবের কথা বলতেই তোমাকে চিঠি লিখছি।

তুমি তো জান, আমাদের সারা বাংলাদেশেই পহেলা বৈশাখ নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। এখন আমাদের রাঙ্গুনিয়াতেও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে ব্যাপক আয়োজনে নানা অনুষ্ঠান হয়। রাজানগরে এবারই প্রথম বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। স্বপন, পুলক, হ্যাপী, চৈতালী, অনিক, দীপা, কুমকুম, নাহার, রাজু, সজল এবং আমি সবাই মিলে সকাল সকাল আমাদের বিদ্যাময়ী স্কুলের মাঠে চলে যাই। প্রথমে ওখান থেকে সকাল সাতটায় শুরু হয় বৈশাখী শোভাযাত্রা। নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুন হাতে আমরা র‍্যালিতে অংশ নিই। র‍্যালি শেষ করে স্কুলের মাঠে চলে আসি। ওখানেই বিশাল আকারে মেলা বসেছে। মাঠের উত্তর দিকে চড়কগাছের আয়োজন, তার পাশে বসেছে চুড়ির দোকান। ছোট ছোট বাক্সে নানা ধরনের চুড়ির পসরা সাজিয়ে বসেছে মহিলারা। তার পাশে চানাচুর ও নিমকি ভাজা ও বিক্রি চলছে। আমি গরম নিমকিভাজা আধা কেজি কিনে সবাই মিলে খেয়েছি আর ঘুরে ঘুরে মেলাটা দেখেছি। মাঠের পূর্ব কোণে বাঁশ-বেতের নানা গৃহস্থালি দ্রব্য নিয়ে বসেছে বিক্রেতারা। ওখানেও বেশ ভিড়। তার পাশেই নানা ধরনের বেলুন, বাঁশির পসরা বসেছে। আমি আমার ছোট বোন প্রিয়স্তির জন্য বেলুন ও বাঁশি কিনেছি। ওর জন্য রঙিন ফিতাও কিনেছি। দীপা তো যেটা দেখে সেটাই কেনে এমন অবস্থা ওর। হাতে যে কয়টা টাকা ছিল, সব টাকায় দীপা ওর ভাই-বোনের জন্য নানা জিনিসপত্র কিনেছিল। রাজু, সজল, হ্যাপী, অনিক, স্বপন বাঁশের তৈরি কলমদানি কিনেছিল। আমরা সবাই মিলে চড়কগাছেও উঠলাম। ওখানে উঠে তো চৈতালী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু কি আর করা, দশপাক না খেয়ে তো আর নামা যাবে না। চৈতালী বলেছে, ও আর কখনো চড়কগাছে উঠবে না।

আজ আর লিখছি না। তুমি ভালো থেকো। জ্যাঠা-জেঠিমাকে শ্রদ্ধা দিও। তোমার সব খবর জানিয়ে আমাকে লিখো। তোমার জন্য অসীম ভালোবাসা রইল।

ইতি

প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া

AIR MAIL	**STAMP**
FROM PRIANKA BORUA RAJA NAGAR CHITTAGONG BANGLADESH	TO FAHMIDA PUTUL MOSCOW RUSSIA

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বিনয়ীকে সবাই পছন্দ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।